হিন্দুস্থান সিরিজ—১

ভোলার ভ্রান্তি।

শ্রীনন্দলাল দাস।

মূল্য এক টাকা।

প্রকাশক—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মণ্ডল।
হিন্দুস্থান-সাহিত্য-প্রচার-সমিতি,
১৩নং কৃপানাথ লেন, হাটখোলা, কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল,
সিদ্ধেশ্বর প্রেস
২৯নং নন্দকুমার চৌধুরী সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা।

উৎসর্গ

হিন্দী ও বঙ্গ-সাহিত্যের উপাসক

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীযুক্ত নরসিংহদাস আগারওয়ালা

মহাশয়ের করকমলে

অর্পিত।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩১ সাল।

১৩, কৃপানাথ লেন,
হাটখোলা।

বিনীত—
শ্রীনন্দলাল দাস।

পৃষ্ঠপোষকগণ

শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী
(ময়মনসিং)

শ্রীযুক্ত অনারেবল ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর)

শ্রীযুক্ত অনারেবল নবাবজাদা সার সৈয়দ আল্‌তাফ
আলি চৌধুরী (বগুড়া)

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী (লক্ষ্মীপুর, আসাম)

শ্রীযুক্ত ধরণীমোহন রায় (আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্)

শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন (বাদুড় বাগান)

শ্রীযুক্ত নরোত্তম দে (বৌ-বাজার)

শ্রীযুক্ত নারায়ণদাস বর্ম্মণ (ক্লাইভ ষ্ট্রীট্)

শ্রীযুক্ত শ্রীনারায়ণ ক্ষত্রী (শম্ভুমল্লিক ষ্ট্রীট্)

শ্রীযুক্ত নরসিংহদাস আগারওয়ালা (হ্যারিসন রোড)

নিবেদন।

কালের সংখ্যাতীত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সাহিত্য-প্রিয় সুধীবৃন্দের ও বঙ্গীয় পাঠিকাগণের সমাপে মদীয় "ভোলার ভ্রান্তি" প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইলাম।

গ্রন্থখানি সকলের আদরের বলিয়া গৃহীত হইবে কি না জানি না। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতদূর সম্ভব ভাব ও ভাষার দ্বারা ইহাকে সুন্দর করিয়া তুলিতে আমি ত্রুটি করি নাই। ভারতের সুবিস্তৃত সাহিত্যোদ্যানের এক প্রান্তেও যদি ইহার স্থান হয়—স্বীয় লেখনীকে আমি ধন্য জ্ঞান করিব। ইতি—

প্রুফ সংশোধনের—ভ্রমবশতঃ স্থানে স্থানে অশুদ্ধ পরিলক্ষিত হইতে পারে, ত্রুটি মার্জ্জনীয়।

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৩১ সাল।
১৩, কৃপানাথ লেন, হাটখোলা।

বিনয়াবনত—
শ্রীনন্দলাল দাস।

ভোলার ভ্রান্তি।

১

পাঠক, আমি আপনাদের অপরিচিত ভোলানাথ নেওগী। গ্রামের জমিদার মহাশয়রা পল্লী-বাস বর্জ্জন করিয়া সাধারণ্যে হিতকর কি অন্যায় দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গেলেন, প্রথমতঃ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমবর্দ্ধমান বনানী ও আবর্জ্জনার দুর্গন্ধ, মশকের উৎপীড়ন ও পানীয় জলের অভাব, আমাকে যখন অতিমাত্রায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল, জন্মভূমির স্নেহ-ক্রোড় হইতে বিদায় লইয়া আমি সহরের জনপুঞ্জের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য আসিলাম।

জীবনের প্রারম্ভে কলিকাতার সহরে আর এক বার আসিয়াছিলাম। সহরের সাজ সজ্জায় বিহ্বল হইয়া অন্তরে দৃঢ় সংস্কার পোষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম যে, বাস্তব জীবনে সুখ ভোগের জন্য আমাদের আর সাধনা করিতে হইবে না—আমরা যদি এই কলিকাতায় বাস করিতে করিতে মরিতে পারি।

স্বর্গ-রাজ্য যে এই সহরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, পাঠকগণ বলিতে পারেন কি? স্থপতিবিদ্যাবিশারদগণের কি মত? স্বর্গের জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অনন্ত পাদপশ্রেণী-শোভিত নন্দনকানন বাঞ্ছনীয় বটে; অধুনা

শতচন্দ্রজিনিপ্রভা বিজলীর মনোলোভা মাধুরী সমন্বিত ইডেন-উদ্যান তারতম্যে কত হীন?

বাক্য দ্বারা আপনারা যাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করুন না কেন. কলিকাতার ন্যায় বিরাট স্বর্গ পৃথিবীর ও-পারে যে আর নাই, আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি।

সুতরাং বনানী পরিশূন্য কলিকাতায় বাস করিতে পারিলেই এখন তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচি। সহরের উপযোগী রূপ-সৌন্দর্য্য নিজস্ব যতটা থাক আর নাই থাক, অর্দ্ধাঙ্গিনীর রূপটি নিখুঁত। স্ব-গ্রামে বসিয়া আহারাদির পর যখন তাহাকে গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিতে দেখিতাম, দেববাঞ্ছিতা এই নারীকে এরূপ স্থানে বাস করিতে দেওয়া যে অনুচিত সর্ব্বদা এই কথাই মনে হইত। পল্লীর অকিঞ্চিৎকর বনভূমিতে এ রূপ দেখিবে কে? দ্বিপ্রহরে মরুভূমির দীপ-রশ্মি যেমন নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ, গ্রাম্য-কুটীরের মাঝে প্রিয়ার মুখখানিও তেমনি নিষ্প্রভ ও ম্লান। অতঃপর ম্যালেরিয়ার বীজাণুবাহী মশকের কি প্রভাব! কোমলাঙ্গে হুল বিঁধিবার জন্য দুর্ব্বৃত্তরা যেন সর্ব্বদাই প্রস্তুত। এই অত্যাচার দেখিয়া মনে হয়, দেশ উদ্ধার হইবার আগে এদের ধ্বংস করিতে পারিলে একটা কাজ হয়। কর্ত্তাদের এ দিকে দৃষ্টি পড়িবে কবে?

নানারূপ চিন্তা করিয়া অপরাহ্নে বাটীর বাহির হইয়া পড়িলাম। সারা রাত্র ট্রেণে জাগরণ করিয়া প্রাতঃকালে হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া নামিলাম। শ্রীমতির বদনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যেন হাস্যকরোজ্জ্বল পূর্ণিমার চাঁদ। কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে স্থানান্তরে গিয়া বসিলাম।

দেখিলাম ষ্টেশনের প্রায় সকল যাত্রীর গায়েই মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ। আমার বিশ্বাস ছিল, দামী পরিচ্ছদ সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তানরাই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। খাঁ সাহেবের পক্ষে চক্রবর্ত্তী উপাধি সম্মানের বদলে যেমন অসম্মান দর্শায়, গরিবের পক্ষে বড়-লোকের অনুকরণীয় বেশভূষাও কতকটা তাই। কিন্তু এই সহর এমন সুন্দর, সকলেই যেন সেই রাজা উজীরের পুত্র। দেখিয়া হতভম্ব হইয়া গেলাম। সহসা বিস্মিত চাহনি শ্রীমতির দিকে ধাবিত হইল। অস্ফুট স্বরে সে আমায় কি বলিল বুঝিতে পারিলাম না। লজ্জায় মাটির দিকে চোখ নমিত করিলাম।

"ওগো সুন্দরী, ওগো মানিনী, অঞ্চলে তোমার চোখ আবৃত কর। নচেৎ ধর এই মুক্ত তরবারি আমূল বিদ্ধ কর হৃদয়ে আমার।"

তরবারি অবশ্য কাছে নাই। অস্ত্র-শস্ত্র হাতে পাইয়া বাঙ্গালীর সাবেক বীরত্ব পাছে আবার জাগিয়া উঠে, চণ্ডনীতির আড়াল থেকে তারা কুরুক্ষেত্রের কাণ্ডটা আবার ঘাটিয়ে বসে, এই কারণেই বোধ হয় সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর কাছ থেকে তা, আগেই আত্মসাৎ করিয়াছেন। সুতরাং ক্ষুন্ন মনে শ্রীমতির সাম্‌নে শূন্য হাত খানাই বাড়াইয়া দিলাম।

আমার এই চঞ্চল ভাব দেখিয়া প্রিয়ার প্রাণ যে একেবারেই আর্দ্র হয় নাই এ কথা আমি বলি না। যে হেতু স্মিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—"আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি কি দেখছ গা ?"

সমস্ত ব্যথা ও আবেগ ওই কথার উপর নির্ভর করিয়া আমি

বলিলাম—"দেখছি তোমার ওই নধর মুখখানি!—ওই কমনীয় তনু।"

বাস্তবিক "সৌন্দর্য্য" শ্রীমতির মুখের উপর আজ যেন তার সর্ব্বস্ব উন্মুক্ত করিয়া বসিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের সৌধচূড়ায় দাঁড়াইয়া, রঙিন্ কাঁচের ভিতর দিয়া সৌন্দর্য্যকে যে এমন দেখায়, আবর্জ্জনার ভিতর দিয়া যে এমনটি দেখা যায় না ইহা আজ বুঝিলাম।

এই বিভূষিত চিত্র কি মনোরম! সুদৃশ্য বপু, অনিন্দনীয় নাসা, অপার্থিব ভঙ্গিমা, আরক্তিম গণ্ড, এ কি আমার সেই স্ত্রী! মলিন বসনে দেহ আবৃত করিয়া পল্লার অপরিচ্ছন্ন সায়ারে যে স্নান করিত, উচ্ছিষ্ট বাসন মার্জ্জনা করিতে নিজেকে যে এতটুকু ছোট বলিয়া মনে করিত না, এ কি সেই মূর্ত্তি? আবর্জ্জনার মাঝে এত রূপ যে কোথায় লুকান ছিল তা জানিতাম না। এই বিরাট ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেছি, সব চেয়ে সুন্দর তাহার আলতা দেওয়া পা দু'খানি।

বৃথা আর গর্ব্ব করিয়া দরকার নাই। বেলাবেলি বাসার সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। প্রেয়সিসহ গাত্রোত্থান করিতে উদ্যত হইলাম। পশ্চাৎ পরিবর্ত্তন করিয়াই দেখিলাম, অতর্কিত ভাবে কে যেন মাথায় এক ঘা লগুড়ের আঘাত করিয়া গিয়াছে। আমার ক্যাম্বিসের ব্যাগটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে অবসর বুঝিয়া কে আত্মসাৎ করিয়াছে। পাথেয় যা কিছু তারই মধ্যে রহিয়াছে। অদূরে একটি বাবু সংবাদপত্র পাঠ করিতে করিতে আমাদের দিকে চাহিয়া কি দেখিতেছিলেন। আমি মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমতির

রূপ দেখিয়া তিনি মনে মনে হয় ত' তার প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহাকেও আর দেখিতে পাওয়া গেল না। অস্থির হইয়া চারিদিক কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছি, শ্রীমতি হতভম্ব হইয়া শুষ্ক মুখে আমার পিছনে দাঁড়াইয়া, সহসা একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—"আমাদের পিছনে বসিয়া যে ভদ্রলোক সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন, ব্যাগটি তিনিই নাকি আত্মসাৎ করিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকটেই বসিয়াছিলেন, তাঁহার চোখে চশমা দেওয়াছিল বলিয়া, তিনি নাকি তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারেন নাই।"

রহস্য ভেদ করিতে আর বিলম্ব হইল না। যে সময় প্রিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া চাতকের ন্যায় আমি তাহার প্রণয় প্রার্থনা করিতেছিলাম, তস্কর সেই সময়ই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ঢেঁকি অবতার রূপে বুকের ছাতি ফুলাইয়া এতদূর আসিয়া, ভবের হাটে এইবার বুঝি আমায় ভবানীর পদ স্মরণ করিতে হয়।

চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে পথের সম্বলটি ত' অপহৃত হইল। এইবার কৃপা করিয়া কেহ কামিনীটির প্রতি দয়া করিবেন কি না ভাবিতেছি। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। বিশ্বাস থাকিলে বিশ্বকে জয় করিতে পারা যায়, বিশ্বাস হারা হইলে বিশ্বাসঘাতকতার দাবীতে কোম্পানীর কারাগারে যাইতে হয়, তথাপি বিশ্বাসকে আর যেন মনে স্থান দিতে ভরসা হয় না। এত বড় অনাচার যেখানে অবাধে রাজত্ব করিতেছে, বিশ্বাস সেখানে কি ভাবে মনে স্থান পায় ?

শৈশবে পুত্রের স্নেহ-ডোর বিচ্ছিন্ন করিয়া জননী যে ভাবে

পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই জন্মভূমির মায়া বিসর্জ্জন দিয়া আমি এই কলিকাতার সহরে চলিয়া আসিয়াছি। যে মাটিতে পূর্ব্ব-পুরুষের অস্তিত্ব বর্ত্তমান, যে মাটির ক্রোড়ে বাল্য-জীবন বড় সুখে অতীত হইয়াছে, সেই মা'টির বুকে হেলায় পদাঘাত করিয়া আমি যে কি ভুল করিয়াছি, ভাগ্য যে আমায় কোন অজানা পথে আমন্ত্রিত করিয়াছে, আমার ন্যায় প্রতারিত জন তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিবেন সন্দেহ নাই।

ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ দারুণ অবসাদগ্রস্থ হইল। এ সময় বিপন্ন পল্লীবাসীর মুখে কেহ এক বিন্দু জল দিবেন কি? আশ-পাশে জনতার কোনো অভাব ছিল না। ভাগ্যক্রমে কেহই আমাদের প্রতি কৃপান্বিত হইলেন না। মনে মনে আমি শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলাম।

ভাবিলাম, পঞ্জিকার নির্দ্দেশ অবহেলা করিয়া, তিথি নক্ষত্র না মানিয়া, নিজের ইচ্ছায় যেমন জন্মভূমিকে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, নিজের জন্মগত অধিকারের প্রতি অবহেলা করিতে ত্রুটি করি নাই, আমার মত অভাগার সে পাপের দণ্ড এখন কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া লইতে হইবে।

"যোগ্য ব্যক্তির নিকট আত্মভাব প্রকাশ করিতে বিশেষ বাধা নাই। ভদ্রের নিকট যাচ্ঞা করা উচিত। প্রয়োজন হইলেও কখনো নীচের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়।" এই মুনিবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া অভাব অভিযোগের কথা আমি কাহার নিকট ব্যক্ত করি? মুষ্টির জন্য কাহার দ্বারস্থ হই? সুবেশ পরিবৃত এই ভদ্রবাবুর দল,

আমার অপহৃতকারী ব্যক্তিও ত' এঁদেরই অনুরূপ ছিলেন। এঁদের মধ্যে সে প্রকৃতির লোক যে আর নাই, ইহাই বা কিরূপে বিশ্বাস হয়? একজনের চালচলন দেখিয়া রাজা ইন্দ্রনারায়ণের কথা মনে পড়িয়া গেল। ভাবিলাম, ইনি বোধ হয় সেই বংশেরই কোনো ধুরন্ধর হইবেন; কিন্তু মানসদৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, মহানুভবের বুভুক্ষিত-দৃষ্টি আমার প্রতি ঠিক ততটা বর্ষিত হইতেছিল না—আমার স্ত্রী বেচারার প্রতি যতটা অবাধে বর্ষিত হইয়াছে। এখন আশ্রয় প্রার্থনা করিব কি এই আশ্রয়-দাতারূপ চণ্ডালের কবল হইতে প্রিয়াকে দূরে সরাইয়া লইব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে একজন প্রবীণ আসিয়া আমাদের সাম্নে উপবিষ্ট হইলেন। ইঙ্গিতে আমাকেও তাঁহার পাশে বসিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার গলায় দিব্য এক ছড়া তুলসীর মালা ঝুলিতেছিল। একে বার্দ্ধক্যে অবনত, অনন্তর গলায় তুলসীর মালা দেখিয়া ভক্তিতে তাঁহার পদতলে মাথাটা যেন স্বতঃই নমিত হইয়া পড়িল।

কিন্তু বুঝিতে পারিলাম না এনার দ্বারা আমরা উপকৃত হইব কি না। দুঃখ যাহাকে অতিশয় ব্যাকুল করিয়া তোলে, কাহারও ক্ষমতা হয় না যে সহসা তাহাকে মুক্তির পথ দেখাইয়া দেয়।

স্ব-কর নির্ম্মিত কামনা-কুঞ্জের প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া হৃদয়কে নিরাশ অন্ধকারে নিহিত করিবার জন্য অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়, সমুদ্রের কূলে দাঁড়াইয়া সলিলে নিক্ষেপ করিবার জন্য অনেকেই মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য একটি প্রাণীকেও

দেখা যায় না, আমার বলিয়া একটি প্রাণীও নিকটে আসে না।

পৃথিবীতে কে যে হৃদয়বান্, কাহার প্রাণ যে বিপন্নের জন্য ব্যাকুল, কে তাহা বুঝিবে? প্রবীণের ভাব দেখিয়া মনে হইল, আর্ত্তের দুঃখে তিনি মর্ম্মাহত, দুঃখীজনকে আশ্রয় দিতে তাঁহার আপত্তি নাই, নিশ্চিন্ত মনে আমি তাঁহারই শরণাপন্ন হইলাম।

২

আপনারা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন যে, যথা সময় সেই প্রবীণের গৃহে আমরা আশ্রয় পাইলাম। তাঁহার নাম নবীনচন্দ্র কুণ্ডু। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের তিনি নাকি একজন পরম ভক্ত। চৈতন্য-চরিতামৃত, অমিয় নিতাই-চরিত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থ তাঁহার শয়ন-কক্ষের কুলুঙ্গিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সময় মত মুদির দোকানের গদিতে বসিয়া আমাকে সেই সব গ্রন্থ পাঠ করিয়া শুনাইতে হয়।

মুদির দোকানের নাম শুনিয়া আপনারা নাসিক করিবেন না। আমি বাস্তবিকই এখন মুদির দোকানের কর্ম্মচারী। সে দিন গ্রাম্য কুটীরে বসিয়া স্বদেশকে কত ঘৃণা করিয়াছি, নিজেকেও কত ধিক্কার দিয়াছি, পরন্তু এ কথা কখনো ভাবি নাই যে, আমার শিক্ষা দীক্ষা ভবিষ্যতে এই মুদির দোকানের চাকুরীতে পর্য্যবসিত হইবে!

এই কলিকাতা নিতান্ত স্বার্থশূন্য স্থান নহে। এখানে স্বার্থ ছাড়িয়া রাজাও প্রজার হিতকামনায় প্রবৃত্ত হন না। বেচারা নবীনবাবু যে সে রীতি অমান্য করিয়া চলিবেন—এ কথা কল্পনা করাও অন্যায়। তিনি আমায় আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিতেও ত্রুটি করিলেন না। প্রত্যূষে তাঁহার একজন ভৃত্য আমাকে তাঁহাদের দোকানে লইয়া গিয়া হাজির করিল।

ভোলার ভ্রান্তি

বাজার মধ্যস্থ একখানি মুদির দোকানে, সিঁদুর মাখান লোহার সিন্ধুকের পাশে, মাথায় নামাবলি জড়াইয়া নবীনবাবু ধূমপান করিতেছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে গিয়া বসিলাম।

দোকান ঘরের দেওয়ালে সনাতন নীতি বাক্য—

"হরি নাম বিনে জীবের গতি নাহি আর,
শ্রীহরি চৈতন্য প্রভু পারের কর্ণাধার।"

ইত্যাদি ধরণের একাধিক বোর্ড দেখিতে পাইলাম।

অদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরে আর একখানি (ক্রেতাগণের চোখে সহজে পড়ে না) বোর্ডে লেখা রহিয়াছে—

"বাজার চলন মিশ্রিত তৈল ও ঘৃত।"

ক্রেতাগণ খাঁটি সরিষার তৈল ও আসল ঘৃত ভাবিয়া অতিরিক্ত দামে তাহাই ক্রয় করিতেছেন।

ক্রেতাগণের দৃষ্টির সাম্‌নে আর একখানি বোর্ড দেখিলাম—

"ধারের জন্য অনুরোধ করিবেন না।"

দেখিলাম, কুলী-মজুর জাতীয় লোক আধ পয়সার সামগ্রী ধার চাহিয়াও পাইতেছে না। নিয়মের কঠোরতা যেন তাহাদের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা বিত্তশালী, বড়দরের রাজকর্ম্মচারী বা সম্পন্ন ব্যবসাদার তাঁহারা হাতচিঠা দিয়া হাজার টাকার মাল নিলেও আপত্তি নাই। পরে টাকা আদায়ের জন্য ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করাই হোক্, আদালত-ঘর করাই হোক্, আর তাঁহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষের প্রতি অখাদ্য ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াই নীরব থাকা হোক্।

ঘড়ির নিচে একখানি বোর্ডে লেখা রহিয়াছে—

"এক দামে বিক্রয়"

কিন্তু দশ আনা দাম হাঁকিয়া আট আনায় বেচিতে কোনো বাধা নাই।

ব্যবসার এই অদ্ভুত চালচলন দেখিয়া আমার চোখের পরদা যেন অবাধে খুলিয়া গেল। বুঝিলাম, স্বার্থের বিন্দু মাত্র অপচয় করিলে বুঝি "বাণিজ্যে-বসতি-লক্ষ্মী" হয় না। হয় ত' স্বার্থ ছাড়া বাণিজ্য-ক্ষেত্রে নামা, আর জলযান ব্যতীত সাগর ভ্রমণের আশা করা একই কথা।

এখন কিছু অর্থের প্রয়োজন। অর্থ সঞ্চয় না হইলে সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে না। অর্থ সঞ্চয় করিতে হইলে বর্ত্তমানে ব্যবসারই প্রয়োজন; কিন্তু ব্যবসার জন্য যে বদ্ধপরিকর হইব, তেমন সংস্থানই বা আমার কোথায়? কিছু যোগাড় হইলে একটি সামান্য দোকান করিয়া বসিলেও দু-পয়সা রোজগার হইতে পারে। মিতব্যয়ী হইলে ওই দু-পয়সা হইতেই অর্থশালী হইতে পারা যায়।

সামান্য'র ভিতর দিয়াই মানুষকে ব'ড়র দিক্ অধিকার করিতে হয়। বাঙ্গালীর জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া দেখিলে এমন ইতিহাস অনেক খুঁজিয়া পাওয়া যায়, ওই সামান্য ভিত্তির উপরে তাঁহারা কত বড় শক্তি আয়ত্ত্ব করিয়া গিয়াছেন। মুহূর্ত্তে কখনও সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। ভীষণ স্রোতের মুখে নৌকা ধীরে ধীরে বাহিয়া যেমন পরপারে গিয়া উঠিতে হয়, তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রে

নামিয়া সা[illegible]'র ভিতর দিয়াই উন্নতির উচ্চ সীমায় পৌঁছাইতে হয়।

নবীনবাবুর ধূমপান করা শেষ হইল। হুকা'টি ...তনি আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নামটি

...নাম—"শ্রীভোলানাথ নেওগী।"

...বু—"ভাল, এক কাজ করগে ; চাক্‌রী বাক্‌রীতে আজ ...সুখ নেই। আমাদের কাছে এসে যখন আশ্রয় নিয়েছ ...তোমার ভালই কর্ব্ব ; উপস্থিত আমার দোকানেই থাক। ...পড়া শিখেছ তারও একটু আধটু চর্চ্চা রাখ, বাড়ীতে ছেলে ...লে আছে তাদের পড়াও। হিঁদুর ছেলে ধর্ম্মকাজটাও জলাঞ্জলি দিয়ো না, দুটি গাভী আছে তাদের সেবা কর, পরকালের কাজ হবে। আমার আপনার বল্‌তে বিশেষ কেউ নাই বাপু, মাত্র দুটো ভাই, ছটা ছেলে আর গোটা পাঁচ ছয় মেয়ে।"

আশ্রয়দাতার শ্লেষ শুনিয়া আমি যারপর নাই বিস্মিত হইলাম। এতগুলি অবতার সংসারে বিরাজ করিতেছে, বিবাদের সময় একখানি লাঠির প্রয়োজন হইলে একত্রে ছয়খানি লাঠি বাহির হইতে পারে, তথাপি আপনার বলিতে তিনি কাহাকেও দেখিতেছেন না। এ যেন গচ্ছিত টাকা স্ত্রীর নামে বেনামী করিয়া মহাজনের দেনার ভয়ে গভর্ণমেণ্টের দেউলিয়া খাতায় নামজারী করা।"

যা হোক অবলম্বনহীন ব্যক্তির নিজের মতামতের উপর আধিপত্য খাটে না, আমি বিনা ওজরে তাঁহারই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলাম।

৩

কয়েক মাস বেশ সুখেই কাটিয়া গেল। অভাব অভিযোগ কোন দিনই উৎপীড়ন করিতে পারিল না। তথাপি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া নিদাঘের দ্বিপ্রহরে শান্ত তটিনীর ছায়া-স্নিগ্ধ সৈকতে নিদ্রিত পথিক সম্মুখে হিংস্রক প্রাণী লক্ষ্য করিয়া স্থানচ্যুত হইবার জন্য যেমন উঠিয়া দাঁড়ায়, সহসা নবীনবাবুর আশ্রয় হইতে বহিষ্কৃত হইবার জন্য আমার মনটাও যেন সেইরূপ উচাটন হইল। কারণ, যে পল্লীতে আমাদের বাস, তথায় ভদ্রের বাস বড়ই দুর্লভ। চারিদিক হইতে শুধু বারাঙ্গনার কণ্ঠস্বরই শুনিতে পাওয়া যায়। নবীনবাবুর গৃহলক্ষ্মীদের সেটা হয় ত' গা-সওয়া হইয়া থাকিতে পারে; কিন্তু আমার পত্নীর মুখ চাহিয়া, আমি কখন সেটাকে উচিত বলিয়া মনে করি না। উপর্য্যুপরি ডাক্তার অমরবাবুর কথা শুনিয়া যতদূর ধারণা হইয়াছে, এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর ভাগ্যে অবিলম্বে কলঙ্ক লিপ্ত হওয়াই সম্ভব।

তাঁহার নাম অমরেন্দ্রনাথ কর, এম-বি। তিনি কলিকাতা সাধারণ হাঁসপাতালের একজন সুদক্ষ হাউস্ সার্জ্জন। অল্প দিন হইল তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছে। এক দিন সন্ধ্যাকালে জাহ্নবীর সৈকতে বসিয়া উভয়ে যখন চন্দ্রদেবকে নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, তিনি আমার মানস-আত্মায় আঘাত করিয়া হঠাৎ বলিলেন—"নবীনা ভার্য্যা নিয়ে বেশ্যাপল্লীতে যারা বাস করে, তাদের চেয়ে পশু পৃথিবীতে আর দুটো নাই।"

ডাক্তারের মর্ম্মঘাতী কথা শুনিয়া মুখখানি যে আমার কতটুকু ম্লান হইয়া গেল, এই হৃদয়ের কতখানি জুড়িয়া যে বেদনা বিস্তার করিল, তাহা বর্ণনাতীত। কথাগুলি তাঁহার মিথ্যা নয়; এইরূপ একটা চিন্তা আগে হইতেই আমার হৃদয়কে বিদগ্ধ করিতেছিল, অমরবাবু আজ তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়া দিলেন।

আমি আবেগ সংবরণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম— "আপনি কি আমাকে নির্দ্দেশ কোরেই এ কথা বল্‌ছেন?"

তিনি সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—"হাঁ, তবে ওই রকম শ্রেণীর জানোয়ার আর যে যেখানে আছে তাদের সকলকে লক্ষ্য কোরেই এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য।"

আমি—"তা অবশ্য বল্‌তে পারেন। কিন্তু মানুষ তার অবস্থা বুঝে কাজ কর্ব্বে ত? আমি যদি বড়লোক হতাম, দু'কথা বল্‌তে পার্ত্তেন!"

ডাক্তার—"ওইটা তোমার আরো ভুল ধারণা হে, বড়লোক হোলে আমি তোমার নরকে থাক্‌তেও নিষেধ কর্ত্তাম না। কারণ বড়লোকের ব্যাঙ্কের খাতা আছে, কলমের কেরামতি আছে, দুষ্টকে দুরস্ত কর্ত্তে তাঁদের বেশী বেগ পেতে হয় না।"

আমি—"দেখুন, এখানকার রীতি-নীতি আমার ভাল জানা নাই। একজনের পুরস্ত্রীর ওপর আর একজন যে অকারণে দৃষ্টি কর্ব্বে—এ কিরূপ রহস্য?"

ডাক্তার—"ওইরূপ রহস্য নিয়েই এই কল্‌কাতার সহর চ'ল্‌ছে হে, মঙ্গল চাও ত' শ্রীমতিটিকে ওখান থেকে সরাও।"

আমি—"তা অবশ্য বলতে পারেন ; কিন্তু মাগী (বারাঙ্গনা) গুলোর আমি ত' কোনো দোষ দেখি না। বেশ্যা হোলেও যতটা সম্ভব তারা আমাদের মেনে গণেই চলে। নবীনবাবুর ভাইটা বরং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া কলহ করে, তবু তাদের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। তারা জমিদারকে নিয়মিত খাজনা দেয়, রীতিমত স্বাধীন ভাবে বাস করে, তবুও আমাদের কাছে যেন চির অপরাধিনীর ন্যায়।"

ডাক্তার—"ও কথা বাদ দাও হে, আমি ওদের কথা তোমায় বলছি না। কুলবধূর দিকে কুচক্ষে চাওয়া ওদের দ্বারা ঘটে ওঠে না। কিন্তু বেশ্যা-বাটীর খোলা মজলিসে শীতের হাড়ভাঙ্গা কাঁপনি সহ্য করেও সখের পাঞ্জাবি কি গরদের ওড়না যারা বর্জ্জন কর্ত্তে চায় না, তাদের প্রবৃত্তিটা তুমি দেখেছ কি ? তারা দেব-উপাসনা ততটা পছন্দ করে না—যতটা পছন্দ করে তাদের রক্ষিতার পদসেবাকে। তাদের বিশ্বাস করা আর সজ্ঞানে ভুজঙ্গের মুখে নিজেকে তুলে দেওয়া একই কথা।"

অমরবাবুর অতিরঞ্জিত কথা আমার কর্ণকুহরে আর পৌঁছিল না। কলিকাতায় আগমনের প্রথম দিনে হৃতকারীর দ্বারা কঞ্চনগুলি হস্তচ্যুত হইয়াছে, পরিণামে সেইরূপ কোনো পুরুষের দ্বারা কামিনীটি পাছে হাতছাড়া হয়, এই ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহার মুখের দিকে আমি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে প্রতিবাদ-সূত্রে বলিলাম—"বেশ্যালয়ে যারা যায় তারা ভাল প্রকৃতির লোক নয় যে তা আমার জানা আছে ; কিন্তু পর-স্ত্রীর ওপর দৃষ্টিপাত কর্ত্তে তাদের কি সরম আস্বে না ?"

ডাক্তার—"তাদের আবার সরম কোথায় হে ? যারা বিবাহিতা স্ত্রীকে ভাল না বেসে বেশ্যার পায়ে প্রাণ ঢেলে দেয়, মাটির ওপর মায়ের তপ্তাশ্রু বিগলিত হচ্ছে তার দিকে না চেয়ে বেশ্যার মাকে 'মা' বোলে ডাকে—সরমের কদর তার কতটুকু বোঝে, মনুষ্যত্বই বা তাদের কতটুকু বজায় আছে ?"

আমি—"তা হোলে বেশ্যাদের চেয়ে আপনি তাদেরই ভয়ঙ্কর বোলে মনে করেন ?"

ডাক্তার—"হাঁ, আমার ত' তাই বিশ্বাস। তোমার যদি প্রতিবাদ কর্ব্বার কিছু থাকে কর্ত্তে পার।"

আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না।

ডাক্তারবাবু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—"দেখ, এই যে বেশ্যাদের কথা বল্লে, এক হিসাবে এদেরও ক্ষমা কর্ত্তে পারা যায়। 'সুরা হিন্দুর পক্ষে বর্জ্জনীয় হোলেও, ঔষধাদি তৈরীর জন্য সময় সময় যেমন মহর্ষির হাতেও দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি ন্যায়-পথে কখনো কখনো এই বেশ্যাদেরও দেখতে পাওয়া যায়। জানি না কি অশুভক্ষণে এরা নারী-জীবন প্রাপ্ত হোয়েছিল, তাই দেবী-চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত না হ'য়ে হীন বৃত্তি নিয়ে সমাজের এক-প্রান্তে পোড়ে রইল। কিন্তু এরা গৃহস্থের শিশুটিকে বুকে নিয়ে মুখ-চুম্বন কর্ত্তে কর্ত্তে তার মায়ের সামনে গিয়ে যখন দাঁড়ায়, নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছ কি, কি সুন্দর দেখায় ! সে দিন প্লাবন-পীড়নে উত্তরবঙ্গ যখন হাহাকার ক'রে উঠেছিল, এরা একটি মাত্র ঐশ্বর্য্য (সাজ-সজ্জা) দূরে ফেলে ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে হাত পেতে দাঁড়িয়েছিল, তখন

এদের মুখমণ্ডল থেকে কি জ্যোতিঃ প্রকটিত হোয়েছিল, চরিত্র এদের কোন্ পথে ধাবিত কোরেছিল, সমালোচনা কোরে আমায় বুঝিয়ে দিতে পার কি? আমি এমন নির্ব্বোধ নয় যে এদেরই দুষি সাব্যস্ত কর্চ্ছি। এ স্থলে এরাও ক্ষমার পাত্রী হোতে পারে; পরন্তু এদের অধীন ধর্ম্মহীন পুরুষ যারা তাদের অপরাধ অমার্জ্জনীয়।"

আমার অবগতির জন্য সুহৃদ্ অমরেন্দ্রনাথ আজ যে কথা ব্যক্ত করিলেন, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রহিল না। স্রষ্টার আদেশ অমান্য করিয়া ধর্ম্মের উচ্ছেদ করাই যাহাদের পেশা, পরনারীর প্রতি আশক্ত হওয়াই যাহাদের স্বাভাবিকতা অথবা চরিত্রহীন যাহাদের এক মাত্র খেতাব, তাহাদের অপরাধ যে অমার্জ্জনীয়, সমাজের হানির জন্য তাহারাই যে দায়ী এ কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। আমি দ্বিরুক্তি করিলাম না।

কিন্তু অমরেন্দ্রবাবু নিবৃত্ত হইলেন না। বলিলেন "দেখ, ওই শ্রেণীর লম্পটদের প্রবৃত্তি এমন নিকৃষ্ট, সুন্দর নারীমূর্ত্তি দেখলে তার দিকে না চেয়ে ওরা থাক্‌তে পারে না। সে গৃহস্থের বধূই হোক্ আর বাজারের বনিতাই হোক্। সেই চাহনির ফলে নারী-চরিত্রে এমন একটি দাগ পোড়তে পারে, অর্থের জন্য কি অলঙ্কারের জন্য কি সাজ-সজ্জার জন্য কি যে কোনও একটা স্বার্থের জন্য পুরুষের ইঙ্গিতের ওপর ওরা সহজেই ঢোলে পোড়তে চায়। তখন পৃথিবীর সহস্র বাধা একত্র হোলেও আর ফিরিয়ে আনতে পারে না।"

আমি যে কি অভিনব ভাষায় অমরবাবুর বাক্য সমর্থন করিব বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার উক্তির প্রতি অক্ষর আমার

হৃদয়-তন্ত্রীতে বজ্রসম আঘাত করিল। আমি বলিলাম—"দেখুন, আমি কোনো কথা আর গোপন রাখব না। কাল প্রাতঃকালে দেখলুম, জলের জন্য আমার স্ত্রী বস্তির কলে দাঁড়িয়ে, তার পিছনে ক'জন বেশ্যাও দাঁড়িয়ে, নবীনবাবুর স্ত্রী কন্যাটিকে নিয়ে সেই মাত্র এলো। কোথেকে এক ব্যাটা মাতাল এসে এমনি বেহায়াপনা সুরু কর্ল্লে, লজ্জায় স'রে পোড়তে পথ পেলুম না।"

অমরবাবু—"বুঝলে ত'? ওই হোতেই নারী জাতির সর্ব্বনাশ হয়। স্বামি ধ্যান স্বামি জ্ঞান স্বামির জন্য আত্মদান কর্ব্বেন, সে প্রথা এখন বিরল। রাজপুতনার শৈলশিখর কিংবা মিথিলার রাজ-প্রাসাদ থেকে সে প্রথা বহুদিন আগে লুপ্ত হোয়ে গেছে। ভীম-সিংহের স্ত্রী পদ্মিনী কিংবা রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতা তাঁরা এই জাতেরই বিদুষী নারী ছিল, কিন্তু সে চরিত্র এখন আর মেলে না।"

আমি আগেকার কথার জের ধরিয়া বলিলাম—"তার পর কি নিগ্রহ ভোগ শুনুন; জমিদারের বস্তিতে বাস, বস্তির কলে যাতায়াত, কেউ গায়ের ওপর ধাক্কা মেরেই চলেছে, কেউ বধূরাণীদের দিকে আড় চোখে চেয়ে চেয়ে হাস্ছে, এই সব দেখে দেখে প্রাণ ঝালা-পালা হোয়ে গেল, কি উপায় করা যায় বোলুন?"

অমরবাবু বলিলেন—"একমাত্র উপায় আশ্রয়টিকে এখনি বর্জ্জন করা, তুমি পারবে কি?"

আমি বলিলাম—"পারি, কিন্তু নবীনবাবু যদি চাকরী থেকে জবাব দেন?"

অমরবাবু বলিলেন—"করুণাময় ভগবান তার পয়ার কর্ব্বেন।"

৮

বেশ্যাপল্লীতে সুন্দরী স্ত্রীকে বেপরোয়া কাছ ছাড়া করিয়া মুদীর দোকানের বাক্সটির উপর বসিয়া থাকা যে কতদূর অন্যায় আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। নবীনবাবুকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলায় তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন। আমিও প্রতিবাদ করিতে নিরস্ত হইলাম না। লেখাপড়া শিখিয়া উপার্জ্জন করিতে পারি আর না পারি, সম্মানের মূল্য বুঝি। জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবার আগে অন্বেষণ করিয়া দেখা উচিত সম্মান কতটুকু বজায় আছে। ব্যাঙ্কের খাতা আর কতকগুলি জমিদারী থাকিলেই মানুষকে বড় বলা যায় না।

মানুষকে পরীক্ষা করিবার শক্তি আমাদের খুব অল্পই আছে। স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া ন্যায় পথে আমরা এক পা'ও অগ্রসর হইতে পারি না, আমাদের চরণ-যুগল যেন অন্যায়ের শৃঙ্খলে বাঁধা। নতুবা যে ব্যক্তিতে ধর্ম্মের আভাষ দেখা যায় না, সমাজ যাহাকে ঘৃণিত ভাবে পরিহার করে, স্বার্থের জন্য সেই নরাধমকে আমরা সসম্মানে আহ্বান করি, আর যিনি আজন্ম ন্যায়ের অনুগামী, সমাজ যাঁহাকে শ্বেত-চন্দনে সুশোভিত করে, স্বার্থহানির ভয়ে সেই মহানুভবের প্রতি অসম্মান দর্শাই। এই হীনতার জন্য কাহাকে দায়ী করা যায়? অনির্ব্বচনীয়

আশার প্রতাড়নায় অস্থির হইয়া অমানুষকে যে মানুষ বলিয়া গণ্য করি, এ অন্যায়ের পরিণতি কোথায় ?

পৃথিবীতে যাঁহার সম্মান নাই, মানের প্রতি যে ব্যক্তির হুঁস নাই, মানুষ বলিয়া গর্ব্ব করিবার তাঁহার আর কি আছে ? সম্মানের পাত্র হইতে পারেন তিনি সেইখানে—যেখানে বারবধূগণের মদিরাবিহ্বল নৃত্য-গীত পরিপূর্ণ।

আমরা সেইখানে, তাদেরই অপবিত্র দ্বারের সাম্‌নে ধর্ম্মপত্নীকে লইয়া বাস করি। অন্যায়ের এত বড় দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতে প্রতিবাদ করিতে আমি নিরস্ত হইব কেন ? জানি দুর্দ্দিনে নবীনবাবু আমায় পুত্র-নির্ব্বিশেষে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই জন্য কি তাঁহার অন্যায়কেও আজ আমায় ন্যায় বলিয়া সমর্থন করিতে হইবে ?

সহস্র বাদানুবাদ সত্ত্বেও তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া আমি বলিলাম—"দেখুন, আমি শুধু নিজের স্বার্থের জন্যই আপনাকে এতটা অনুরোধ কচ্ছি না। আপনি বোল্‌ছেন—"পতিতা হোলেও ওরা (বারাঙ্গনা) ঈশ্বরের সৃষ্ট।" এ কথা আমি স্বীকার করি। আমার বিশ্বাস, নারীর সর্ব্বস্ব গেলেও তাদের লজ্জাশীলতা সমূলে নষ্ট হয় না। হয় ত' চোখ রাঙিয়ে তাদেরই আপনি জব্দ কোরে রাখতে পারেন ; কিন্তু যে ব্যক্তিরা তাদের রক্ষক, হুকুম দিয়ে তাদের জব্দ কোরে রাখবার শক্তি আপনার কতটুকু আছে নবীনবাবু ?

"আমি প্রতিজ্ঞা কোরে বোল্‌তে পারি যে, তারা ন্যায়ের বশীভূত নয়, তারা সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর, বজ্রের চেয়েও ভীষণ। তাদের হীনতা অপেক্ষা শিষ্টাচার আরো ভয়াবহ। তাদের মত অধম জীবকে

আঙ্গিনার পাশে রেখে ভদ্রতার পরিচয় দেওয়া, আর মরণকে কাছে রেখে জীবনের আশা করা সমান কথা।

"তার পর অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী প্রভৃতি আদর্শ নারীদের চরিত্র নিয়ে আপনি যে আজ-কালের মেয়েদের চরিত্র আলোচনা করেন, এটা আপনার ভুল নয় কি? আজ-কালের মেয়েদের ওপর যতটা সরল ভেতর ততটা সরল নয়। সীতা ও সাবিত্রী যখন এ দেশে জন্মগ্রহণ কোরেছিলেন, তাঁদের বাহুপাশে বদ্ধ হবার জন্য রাজা রামচন্দ্র, মহাত্মা সত্যবানও দেশে উপস্থিত ছিলেন। এখন যেমন পুরুষাকার—তেমনি নারী প্রকৃতি। পুরুষ আরামের আস্বাদ পেলে নরকের বুকে লুটিয়ে পোড়তে যেমন পশ্চাৎপদ হয় না, আরামের জন্য মহাপাপের বজ্র তেমনি ওরাও বুক পেতে নিতে পারে।

"তার পর জাতীয়-জাগরণের দিনে "নারী-স্বাধীনতা" একটি দুর্লভ প্রথা। তথাপি আমাদের দেশের সে দিন এখনো আসে নাই, সাধারণের সে উচ্চতা এখনো জন্মে নাই যে, নারীকে এই ভাবে স্বাধীনতা দিয়ে আমরা চুপ কোরে বোসে থাকৃতে পারি।"

নবীনবাবু ভীষণ উত্তেজনার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"তোমার অসার বক্তৃতা শুন্‌তে আমি নারাজ। অপছন্দ হয় ত' আমার বাড়ী তুমি এখনি পরিত্যাগ কোর্‌তে পার।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া নবীনবাবুর বাক্যই সমর্থন করিলাম।

দেখি অজানা ভবিতব্য আমায় কোন্ পথে পরিচালিত করে। উদ্বেগে যে অন্যায় করিয়াছি, ভ্রমবশে যে বিষে জর্জ্জরিত হইয়াছি,

স্বেচ্ছায় যে মহাপাপকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছি, তাহার ফলভোগ আমায় করিতেই হইবে। অদৃষ্টের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে নামিয়াছি, দেখিতে হইবে এ যুদ্ধের শেষ কোথায়!

৫

নিজেকে বাঁচাইবার চেষ্টা যতটা থাক আর নাই থাক, প্রিয়তমার চরিত্রে পাছে কলঙ্কের ছাপ পড়ে, পাছে গণ্ডির বাহিরে গিয়া অবোধ স্বামিকে অষ্টরম্ভা দর্শায়, সম্ভবতঃ এই ভয়েই বীরের ন্যায় নবীনবাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আসিলাম।

উপদেষ্টা অমরেন্দ্রবাবুর গৃহে আসিয়া অতিথি হইলাম। সে দিন গাঢ় অন্ধকার শিয়রে নিয়ে কু-পল্লীর আঙ্গিনায় অশান্তভাবে কালযাপন করিয়াছি, আজ নিশ্চিন্ত মনে ভদ্র-পুরিতে অবস্থিত। দুঃখ নাই, চিন্তা নাই, আরামের কিছুমাত্রও ত্রুটি নাই। অমরেন্দ্রনাথের সৌজন্যতা দেখিয়া মনে হয়, তিনি পূর্ব্ব-জন্মে আমাদের কোনো আত্মীয় ছিলেন ; নতুবা এই স্বার্থপূর্ণ জগতে এতটা স্নেহ করিবেন কেন ?

কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহের উপর ভর করিয়া কত দিন আর বসিয়া থাকা যায় ? "পরান্নে লালিত কুক্কুর" এই মর্ম্মদাহ বাণী আর কতকাল সহ্য করা যায় ? এখন যে কোনোও একটি চাকুরীর প্রয়োজন। প্রাণের আবেগে প্রীতিদায়িনী পল্লীমাতাকে যে দিন সহাস্যে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, দাসত্ব-শৃঙ্খল সেই দিনই আমার গলদেশ শোভিত করিয়াছে। এখন মোট বহন করিতেও আর বাধা নাই।

অনন্যোপায় হইয়া অমরেন্দ্রবাবুকেই চাপিয়া ধরিলাম। অনেক

খোঁজা খুঁজির পর বিখ্যাত হোরমিলার কোম্পানীর অফিসে তিনি আমার একটি চাকুরী ঠিক করিয়া দিলেন।

চাকুরীতে ব্রতী হওয়ায় দুশ্চিন্তা অনেকটা কমিয়া গেল। মাস শেষ হইলেই নগদ চাল্লিশ টাকা হাতে পাইব। সজ্জাহীনা প্রিয়তমাকে এইবার মনের মত করিয়া সাজাইতে পারিব না কি? অমরেন্দ্রবাবুর প্রিয়তমা কুরূপা, কিন্তু নবযুগের সাজ-সজ্জা বেচারীর কুরূপকে এমন ভাবে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, আমার সর্ব্বসুলক্ষণা সুরূপা স্ত্রীও তাঁর কাছে অপদার্থ।

ক্রমে মাহিয়ানার দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। দীর্ঘ এক মাস পরিশ্রমের পর "গোলামির পুরস্কার" চাল্লিশ টাকা আমার হস্তগত হইল, আহ্লাদের সীমা রহিল না।

হায় গোলামী, কে বলে তুমি মন্দ! বাঙলার নির্ব্বোধরা তোমায় ঘৃণা করিয়া থাকে; কিন্তু তোমার কৃপায় পৃথিবীর কোন্‌টা না পাওয়া যায়! প্রেয়সীর বিষণ্ণ-অধরে হাসি ফুটাইতে, তাহার পিতা-মাতার মনঃতুষ্টি করিতে তোমার সম সুদক্ষ পৃথিবীতে কে আছে? যে সমাজের হেয়স্পদ তোমার কৃতীত্বে সে ব্যক্তিও সম্মানের দাবী করিয়া বসে, ধর্ম্মকেও মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হয়।

মাত্র চাল্লিশ টাকা পাইলাম। তা'ও রূপার টাকা নয়, চারখানি কাগজ (দশ টাকার নোট)। টাকার যে একটা ভারিত্ব আছে (যার ভারে স্বার্থের দিকে আমাদের প্রবৃত্তিটা সহজেই নুইয়া পড়ে) তার ত' কিছুই বুঝিলাম না। ভার না পড়িলে কি ভারি হইতে পারা যায়? এই হাল্‌কা কয়খানি কাগজে সে সাধ পূর্ণ হইবে কেন?

মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। ষ্ট্রাণ্ড রোডের মোড়ে এক ফলওয়ালার দোকানে গিয়া নোট চারখানি ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলাম। সে ব্যক্তি নোট প্রতি দু-পয়সা হিসাবে বাটা চাহিল।

কিন্তু আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে এমন মজার সৃষ্টি করিয়াছেন, কাগজের বিনিময়ে কাগজই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, রূপা ও সোণা আমাদের যেন ধর্ম্মঘট করিয়া গিয়াছে।

আমি ফলওয়ালাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম—"বাপু, আমার কাঁচা টাকার দরকার। টাকা থাকে ত' দাও, নইলে চাই না।"

বেচারা বোধ হয় মনে করিল, চট্টগ্রাম কিম্বা সাঁওতাল পরগণা হইতে কলিকাতায় আমি এই প্রথম আসিয়াছি। মুখভঙ্গি বিকৃতি করিয়া সে আমায় বলিল—"যা দিচ্ছি তোমার ঘাড়কে নিতে হবে মশা, আমাদের ঘরের তৈরী টাকা নয়।"

কি বিপরীত বিপত্তি দেখ দেখি! যেন মারাট্টা বা বর্গীর হাঙ্গাম। এ ব্যক্তি যা বলিতেছে আমায় অবনত শিরে মানিয়া লইতে হইবে। রক্তমাংসের দেহ এও কি সহ্য করে? কোথায় শিক্ষিত বঙ্গদেশীয় ভদ্রলোক, আর কোথায় কাবুলের এই নিরক্ষর পাঠান। পদদলিত জাতি বলিয়া এর কাছেও আমায় নতভা স্বীকার করিতে হইবে।

মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। আমি দৃঢ়-স্বরে বলিলাম—"আমার টাকার প্রয়োজন নাই।"

বেচারা দোকান হইতে সদর্পে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। টাকা না চাও বাটা তোমায় দিতেই হবে। তোমার বাবার চাকর নয় যে, এতক্ষণ আমি মুফতে খাটলুম।"

ভোলার ভ্রান্তি

নীচের এই বেয়াদপিটা একবার পরিদর্শন করুন মহাশয়! বাক্স খুলিয়া নোট কয়খানি বাহির করিয়াছে বলিয়া তাহার পারিশ্রমিক আমায় দিতেই হবে। আমি কিছুতেই স্বীকৃত হইলাম না। লেখাপড়া শিখিয়াছি, আইন-কানুন জানা আছে, এ ব্যক্তিকে ভয় করিবার আমার কি প্রয়োজন?

অল্পক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে বহু লোকের সমাগম হইল। জনৈক বেশবিন্যাসধারী "বাবু" ভিড় ঠেলিয়া একেবারে আমার পিঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

হাঙ্গামার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। অনেকে ফলওয়ালাকেও দোষ দিলেন। কিন্তু ভদ্রবাবুটি সকলের কথা চাপা দিয়া আমাকেই প্রধান দূষি সাব্যস্ত করিলেন।

আমি বলিলাম—"মহাশয়, আমি যদি না নি, ও ব্যক্তির কি অধিকার আছে যে আমায় জোর করিয়ে নেওয়াতে পারে?"

বাবুটি বলিলেন—"তা পারে না; কিন্তু নোট ভাঙ্গিয়ে সব রূপার টাকাই যে "চাই"—এ কথা বল্‌বার তোমারই বা কি অধিকার আছে? জান (?) গভর্ণমেণ্টের স্বাক্ষরিত জিনিষ না নিলে শাস্তিভোগ কর্ত্তে হবে?"

আমি বলিলাম—"জানি, কিন্তু আমি নিতে ত' অস্বীকৃত নই; আমার প্রয়োজন যা আমি তাই চাইছি।"

আমার অনুরোধ ও আপত্তির প্রতি কেহই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। বাক্‌বিতণ্ডার বিজয় বিষাণ পাঠানের পক্ষেই বাজিয়া উঠিল। কেহ বলিলেন, "আমি বোকা" কেহ বলিলেন "পাড়াগেঁয়ে-মেড়া"

ইত্যাদি রূঢ় ভাষা শুনিতে শুনিতে কর্ণ বধির হইয়া গেল। পরাজয় স্বীকার করিয়া আমি বলিলাম—"বাপু হে, আর বাক্‌বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, এক টাকার নোটই আমায় দাও।"

সক্রোধে পকেট হইতে নোট কয়খানি বাহির করিতে গিয়া দেখিলাম, শূন্য পকেট। অবসর বুঝিয়া পকেটটি পর্য্যন্ত কে কাটিয়া লইয়াছে। বিস্মিত-নেত্রে পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকটির অনুসন্ধান করিলাম। দেখিলাম, তিনিও অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। জনপুঞ্জের ধিক্কার আর পাঠানের তিরস্কার সহ্য করিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলাম।

কিন্তু মনের গতিকে আর যেন ফিরাইয়া আনা যায় না। এই দুরন্ত ব্যথার বোঝা কতক্ষণ বহন করা যায়? দেহ যদি নিজের হাতে থাকিত, আত্মার উপর যদি নিজের অধিকার বিস্তৃত হইত, হয় ত' আত্মহত্যা করিয়া জীবনের সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিতাম। কিন্তু এ হৃদয় যে এখন প্রিয়তমার নিদ্রার আগার। গভীর নিশিথে উপাধান হইতে মাথা উঠাইয়া সে যে ইহারই উপর ন্যস্ত করিয়া নিদ্রা যায়। প্রভাতের সূর্য্যচ্ছটায় নীলাকাশ যখন চমকিত হইয়া উঠে, বিহঙ্গকুল মধুর গীত-ধ্বনিতে বিশ্বকে যখন পাগল করিয়া তুলে, বসুন্ধরা যখন অভিনব সজ্জায় দৃষ্টির ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেয়, চোখ উন্মিলন করিয়া দেখি, সম্মুখেই প্রিয়তমার প্রতিচ্ছবি। সে ফাল্গুনের পাগল হাওয়ার মত দ্রুত আসিয়া আমারই হৃদয়ের উপর লুটিয়া পড়ে। প্রেমাধিনীর এই যে বাঞ্ছিত দেহখানি, আমি কি স্বহস্তে ইহার বিনাশ করিতে পারি?

মরণ বাঁচনের জন্য আমি চিন্তা করি না। বাহ্যিক বাসনাকে

হয় ত' অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারি ; কিন্তু আমার আকস্মিক মৃত্যুতে প্রিয়ার কি হইবে, দুঃখ তাহাকে কি ভাবে উৎপীড়ন করিবে, সে কত কাঁদিবে, এই চিন্তা চিত্তকে পাগল করিয়া তুলিল। সে যে আমায় ছাড়া জানে না, আমার শান্তির জন্য সে যে আজীবন নিয়োজিত, আমাকে আহার করাইয়া সে যে বড় সুখী হয়, তাহার কোমল বাহুর পরশে ঘুম পাড়াইয়া সে যে পরম তৃপ্তি অনুভব করে।

হে বিশ্বনিয়ন্তা করুণাময় ঈশ্বর, অকৃতজ্ঞ আমি, মহাপাপের দ্বার আমিই স্বহস্তে উন্মুক্ত করিয়াছি, অশান্তির বোঝা আমাকেই বহন করিতে দাও, আমি বিচলিত হইব না। কিন্তু সেই নিরাভরণা কলঙ্ক পরিশূন্য অবলার প্রতি অপ্রসন্ন হইও না, তাহার শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখ।

৬

দুর্ভাগ্যের কথা ব্যক্ত করিতে হৃদয়ের যে কতটা ভাঙ্গিয়া যায়, যিনি ভাগ্যহীন ব্যক্তি তিনিই অনুধাবন করিতে পারেন। এই কতক্ষণ আগে আশার উচ্ছ্বসিত উদ্বেগ যে হৃদয়কে শান্তি পরিসিক্ত করিয়াছিল, সেই হৃদয়কে মরুপ্রান্তরে পরিণত করিল কে? জগতের যেখানে শয্যা পাতিয়া পান্থ বিরাম নিদ্রায় অভিভূত, আমি তাহারই ছায়াতলে দাঁড়াইয়া আজ অশান্তির তাড়নায় মর্ম্মাহত, এ অভিশাপ কাহার?

ভাগ্য সমস্যার কথা লইয়া জগতে প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার আগে, কর্ম্মফল নিরীক্ষণ করিয়া দেখা উচিত। অশান্তির জন্য কেবল ভগবানকেই শত্রু ভাবা উচিত নহে। দেখিতে হইবে কর্ম্ম আত্মাকে নির্দ্ধারিত পথে পরিচালিত করিয়াছে কি না। নরকে আসিয়া কখনো নন্দনের আকাঙ্ক্ষা করা চলে না।

মন বিষম বিচলিত হইয়া উঠিল। উন্মাদের ন্যায় বিদ্রূপকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম—"এস প্রিয়তম, আমার হৃদয়-মন্দিরে অধিষ্ঠিত হও। বিশ্বলোক তোমায় অপবাদ দেয়, তোমায় ঘৃণার চক্ষে দেখে, দ্বার উন্মুক্ত কোরে রেখেছি—তুমি এস, আমি তোমার পূজা করি।"

মনের সঙ্গে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া, ধীরে ধীরে বাটীর সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। পৃথিবীর বিরাটমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। এমন মূর্ত্তি যেন অনেকদিন দেখি নাই। অন্ধকার পরিবৃত জনপথ যেন আমারই প্রতীক্ষায়

দাঁড়াইয়া। অকৃতজ্ঞকে চিন্তার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া সংহার করাই বুঝি তাহার অভিপ্রায়।

বাড়ীতে প্রবেশ করিতে চরণ যেন আর চলে না। মনে হইল অদূরে এমন তীক্ষ্ণ অস্ত্র আমার শির লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাটীতে প্রবেশ করিলেই যেন নিহত করিবে। নহিলে প্রাণ এ ভাবে কম্পিত হইবে কেন? সর্ব্বদাই মনে হইতেছে, অমরেন্দ্রনাথ বিদ্রূপের বর্ষা লইয়া ওই বুঝি আমায় আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। অন্তঃপুরচারিণীগণ নিন্দার ডালা সজ্জিত করিয়া ওই বুঝি আহ্বান করিতেছেন। স্পষ্টই যেন শুনিতেছি, আমার স্ত্রী বলিতেছে—"এমন অকৃতজ্ঞ স্বামির হাতে আমার না পড়াই উচিত ছিল।"

"নিশিতে লুকায়ে হায় চোরের প্রায়"—বৈঠকের এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। অমরেন্দ্রনাথ তখন হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান গাহিতেছিলেন—

খুলে দে স্বার্থ আমার বাঁধন
খুলে দে আমার চোখের বাঁধন,
আমি চাহি না অর্থ মোহ আভরণ
পৃথিবীর হেয় বাঞ্ছিত ধন।

নিতে যাহা চাহি দিতে কেহ নারে,
মন ভেসে যায় মহাপারাবারে,
মুক্তির বীণা বাজিছে সেথায়
দেখিব বিরলে আপন জীবন।

মোহ নিশা হেথায় হবে না ভোর,
কাটিবে না কভু সে মোহের ঘোর,
মুছিবে না রেখা জীবনের লেখা,
ভাঙ্গিবে না সাধের সোণার স্বপন।

সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি বিশ্বের বিরাম-ক্রোড় মুখরিত করিয়া তুলিল। দুঃখের বিষয় সে রসে আমি বঞ্চিত।

অমরেন্দ্রনাথের পার্শ্বে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। আজ আমার মাহিয়ানার দিন ছিল তিনি জানিতেন। মুখমণ্ডলে কষ্টের চিহ্ন পরিস্ফুট দেখিয়া বিস্মিত ভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারণ কি?"

আমি ঘটনার আদ্যন্ত বিবরণ জ্ঞাত করিলাম। তিনি কাতরোক্তি না করিয়া বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। ভর্ৎসনার তীব্রবাণে জর্জ্জরিত করিয়া বলিলেন—"তোমার মত লোকের কল্‌কাতায় না আসাই উচিত ছিল হে, এমন নির্ব্বোধ তুমি!"

আমি বলিলাম—"মহাশয়, কল্‌কাতায় আস্‌বার আগে ধর্ম্ম যে মাটি চাপা দিয়ে আস্‌তে হয়, আর সরল চোখের বদলে দুটো যে স্বার্থের চোখ নিয়ে পথ চল্‌তে হয়, এ ধারণা আমার ছিল না।"

অমরেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিলেন—"যেতে দাও ভাই, এবার থেকে তিন চোখ নিয়ে পথ চল্‌তে চেষ্টা করো।"

আমি উত্তেজনার ভরে বলিলাম—"দেখুন, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, কল্‌কাতায় আমার না আসাই উচিত ছিল। এখানের সৌধ-চূড়ায় বোসে যাতনা পাওয়ার চেয়ে, পল্লীর সেই আবর্জ্জনাই ভাল।"

অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"জেনে শুনে তবে সাপের বিষ খেলে কেন ভাই ?"

স্বকীয় কর্ম্মের প্রতি কটূক্তি করিয়া আমি বলিলাম—"দেখুন, কল্‌কাতায় এসে দস্যুর হাতে পোড়ে এই যে লাঞ্ছনা ভোগ কর্চ্ছি, এ জন্য দায়ী কি আমরাই ?"

অমরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"না হে বাপু, তা আমরা বুঝি ; তোমাদের চেয়ে পল্লীগ্রামের সেই বিত্তশালী ব্যক্তিরাই বেশী দায়ী। তাঁরা কল্‌কাতার অট্টালিকায় বোসে বিলাসে মত্ত রয়েছেন, ঘোড়দৌড় খেলে হাজার হাজার টাকা অপব্যয় কর্চ্ছেন, বারাঙ্গনাদের মনঃতুষ্টি কোরে বংশের মুখোজ্জ্বল কর্চ্ছেন, স্বদেশের কথা স্মরণ কর্ত্তে তাঁদের সময় হয় না। দেশ আবর্জ্জনায় ছেয়ে যাচ্ছে, ব্যাধির প্রবর্ত্তন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, জলাভাব বিরাট মূর্ত্তিতে পল্লীকে গ্রাস কর্‌তে ছুটছে, গরিব কতক্ষণ সহ্য কোরে থাক্‌তে পারে ! কাজেই তারা দেশ ছেড়ে চলে আস্‌তে বাধ্য হয়। দেশের ধনীসন্তানগণ যত দিন না প্রাণস্থান পল্লীর দিকে ফিরে চাইবেন, যত দিন না তাঁদের এ ধারণা বদ্ধপরিকর হবে, গরিবের প্রবৃত্তি ততদিন পরিবর্ত্তন হবে না, বাঙলার হাহাকার ততদিনই বজায় থাক্‌বে।"

আমি আবেগের ভরে বলিলাম—"আপনি ঠিক কথাই বলেছেন অমরেন্দ্রবাবু, দেশের সম্পন্ন ব্যক্তিগণের যদি দেশাত্মবোধ থাক্‌তো, দেশ বোলে যদি তাঁরা চিন্‌তো, এই সোণার বাংলায় আজ সোণাই সাজান থাক্‌তো।"

অমরেন্দ্র বাবু—"কি জান ভোলানাথ, স্বার্থ বড় চমৎকার জিনিষ !

নিজে সুখী হব, নিজে পরিষ্কার খাব, পরিচ্ছন্ন পোর্‌বো, এমন আশা আমাদের দেশের দীন-ভিক্ষুকরাও কোরে থাকে, যাঁদের দু'পয়সা আছে তাঁরা ত' কর্ব্বেনই। গরিব মরুক বাঁচুক,—পর্ণকুটীরে মাথা গুঁজে থাকুক্,—অন্ন-জলের জন্য হাহাকার করুক, তাঁদের কি ক্ষতি? মনেও ভেবোনা যে, গরিবের জীর্ণকঙ্কাল তাঁদের আত্মাকে বিকলিত কর্ব্বে। ও সব তর্ক ছেড়ে দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ফেলগে। একটা কথা স্মরণ রেখো, অদৃষ্টকে কখনো তাচ্ছল্য কোরো না।"

অমরেন্দ্রবাবুর শ্লেষপূর্ণ বাক্য শুনিয়া যতদূর বুঝিতে পারা গেল, আমার বেয়াদপির জন্য তিনি বিশেষ দুঃখিত হন নাই, তিনি আমাকে ভালবাসেন, আমাকে দুঃখের আবর্ত্তন হইতে টানিয়া তুলাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু শয়তানের প্রতারণায় পথহারা হইয়া আমি যে অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি, মোহের তিমিরে ডুবিয়া যে চিন্তার হার গলায় পরিয়াছি, জল নাই, বায়ু নাই, ছায়া নাই, শয্যা নাই, তপ্ত বালুতে শয়ন করিয়া যে কঠোর নির্য্যাতন উপভোগ করিতেছি, মানবের ক্ষমতা কি যে, সেই সন্তাপের কবল হইতে আমায় দূরে টানিয়া লয়।

যে প্রাণ অকারণে ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয়, যে মন্দিরের সান্ধ্যদীপ অকস্মাৎ নিভিয়া যায়, বজ্র মুহুর্মুহু গর্জ্জন করিয়া, যে হৃদয়ের উপর অকালে আছাড় খাইয়া পড়িতে চায়, সেই হৃদয়কে স্নেহের পরশে কোমল করিয়া—আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ ব্যর্থ করা কি সহজ? জানি না অমরেন্দ্রনাথ কতদূর কৃতকার্য্য হইবেন। আমার কর্ত্তব্য তাঁহার আজ্ঞা অবনত শিরে মানিয়া লওয়া। আমি দ্বিরুক্তি না

করিয়া ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের ভিতর গিয়া দেখিলাম, দক্ষিণের মুক্ত বাতায়ন-পথে বসিয়া শ্রীমতি তন্ময় চিত্তে কি ভাবিতেছে। আমাকে দেখিয়াই তাহার মুখ যেন অস্পষ্ট হাসিতে ভরিয়া উঠিল। একবার ভাবিয়া দেখিল না যে, তাহার হতভাগ্য স্বামী সারা মাসের পরিশ্রমের অর্থ চোরের হাতে তুলিয়া দিয়া আজ কি মর্ম্মব্যথা লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছে।

৭

ফলের দোকানের পকেট কাটার দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত এক মাস উত্তীর্ণ হইয়া গেল। এই কয়দিন অশান্তি আমায় সর্ব্বদাই জ্বালাতন করিয়াছে। আহারে অশান্তি, নিদ্রায় অশান্তি, পৃথিবীর যে দিকে চাহি অশান্তি, আমি যেন অশান্তির দেশে তাহার ক্রীতদাসরূপে বিরাজ করিয়াছি।

আগামী কল্য মাহিয়ানা পাইবার দিন। তাই কি অশান্তি আজ আমায় সভয়ে পরিত্যাগ করিতে চাহে? কে জানে, কিন্তু আমার চিত্তের উপর তাহার সে অধিকারটুকু আর নাই। তাহার রাজত্বকাল বুঝি শেষ হইয়াছে, সে এখন ভাত অন্তরে চম্পট দিবার জন্যই প্রস্তুত।

লজ্জায় অনেকদিন প্রিয়তমার সহিত ভাল ভাবে কথা-বার্ত্তা বলি নাই। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর আসিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

অনেক দিনের পর তাহার দেহের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তাহার আজানুলম্বিত চিকুরগুচ্ছ পবন-হিল্লোলে মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। উন্মুক্ত বেণীর শোভা-সম্পদ দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

কিন্তু মন পরিতৃপ্ত হইল না। কবরীর সহিত চিরুণীর সংযোগ না হইলে সৌন্দর্য্য যে অক্ষুণ্ণ থাকে না। কেশের কৃষ্ণ-চূড়ার অভ্যন্তর হইতে সোণার উজ্জ্বলতা যদি প্রকটিত না হয়, প্রিয়জন পরিতুষ্ট হইতে পারে কি? মনে ভাবিলাম মাহিয়ানা পাইলে কালই ইহার ব্যবস্থা করিয়া দিব। চিরুণী না হইলে যে কবরী মানায় না।

হাতে দু'খানি রবারের রুলি ছিল। আজ দেখিলাম, অমরবাবুর স্ত্রী দু'খানি সোণার শাঁখা পরাইয়া দিয়াছেন। সুবর্ণ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী হইলেও অন্ধকারে তাহার চমক্‌টা যেমন আরো সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হয়, সুগোল বাহুদ্বয়ের উপর শাঁখার জ্যোতিও সেইরূপ সুন্দরত্ব ফুটাইয়াছে।

মধুর সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"গত মাসের বেয়াদপির জন্য আমার ওপর তুমি খুব চটেচ, না ?"

সে লজ্জিত মুখখানি নত করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিল।

কি সুন্দর এই হাসিটুকু ! যতদিন পল্লীগ্রামে ছিলাম এমন হাসি যেন একদিনও দেখি নাই। এই অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি দেখিয়া মনে হয়, কলিকাতায় আমার সর্ব্বস্ব গেলেও আর ক্ষতি নাই। অনুরাগে স্বদেশের জন্য প্রাণ কাঁদে বটে ; কিন্তু প্রিয়ার সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া যখনি তাহার রূপ-পরিবর্ত্তনের কথা আমার মনে পড়ে, কলিকাতাই আমার স্বর্গ ভাবিয়া অনন্ত দুঃখকে আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করি !

হাত দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—"দেখ, এক দেশ থেকে আর এক দেশে এলে প্রথমটা সেখানে বোকা সেজেই থাক্‌তে হয়। এবার আর আমায় কেউ ঠকিয়ে নিতে পার্‌চে না।"

শ্রীমতি হাসিয়া বলিল—"এইবার তা হোলে তুমি চতুর হোয়েচ বল ?"

আমি বলিলাম—"দরকার হয় ত' পরীক্ষা কোরে নিয়ো। উপস্থিত এক কাজ কর্ত্তে হবে ; কাল মাইনে পেয়ে কিছু টাকা

দোবো, তোমার সইকে দিয়ে একখানা চিরুণী তৈরী কোরে নিয়ো।”

শ্রীমতিকে অমরেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ‘সই’ বলিয়া ডাকিত।

শ্রীমতি সন্তোষচিত্তে বলিল—“তা হবেখ’ন। সইয়ের শাঁখা দু’গাছা আমার হাতে বেশ মানিয়েচে, না?”

আমি—“না হয় আগে শাঁখার ব্যবস্থাই কোরে নাও, কি বল? না চিরুণী খানাই আগে হোক্। আগামী মাসে তখন শাঁখার ব্যবস্থা হবে। বাস্তবিক গহনা না পোল্লে তোমায় মানায় না।”

শ্রীমতি—“আজকাল এসেন্স মাখ্‌তে আমার খুব ভাল লাগে।” আগে শুন্‌তুম ও-সব অস্পর্শীয় জিনিষ, বড় ঘৃণা কর্ত্তুম।”

আমি—“দেখ, সুন্দরত্ব যে বোঝে না, সুন্দরত্বকে সেই-ই কুৎসিত বোলে মনে করে।”

শ্রীমতি—“কাল আমায় এক শিশি ভাল এসেন্স এনে দিয়ো।”

আমি—“আজ হেস্‌লিন মেখেছিলে?”

শ্রীমতি—“সে ত’ বিকালবেলা সাবান মাখবার পরই। ওটিও বড় চমৎকার জিনিষ। দেখ দেশ থেকে আস্‌বার সময় তুমি যে কল্‌কাতার সুখ্যাতি কোরেছিলে তা ঠিক।”

আমি—“দেশের কথা তোমার মনে পড়ে? সেই গোলপাতার ছাউনি দেওয়া ঘর,—সেই মাটির দেওয়াল?”

শ্রীমতি—“একবার একবার মনে পড়ে।”

আমি—“খুব ভাল মনে পড়ে?”

শ্রীমতি—“নাঃ—তবে দুপুরবেলা কলাগাছের ছাওয়ায় যে

মাদুর বিছিয়ে বোস্‌তুম, সেই কথাটা খুব মনে পড়ে। আমার বড় ভাল লাগতো।"

আমি—"কি জান, অনেকদিনের অভ্যাস আমরা একদিনে ভুল্‌তে পারি না। যা'ই বল না কেন আগের চেয়ে আমরা এখন সুখী হোয়েচি।"

শ্রীমতি—"আমিও একবার একবার তাই মনে ভাবি, সেই তুমি, সেই আমি, সেই প্রভাত, সেই রাত্রি, তবুও যেন কত ভিন্ন! ভেতরে ভেতরে যেন কতবড় একটা পরিবর্ত্তন হোয়ে গেছে।".

আমি—"কিসে তা বুঝলে?"

শ্রীমতি—"এই দেখনা কেন, আগে প্রাতঃকালে ঘুম থেকে না উঠলে মন যেন ধড়পড় কর্‌ত, মনে হোতো কতক্ষণে খিড়কীর-ঘাটে গিয়ে জলস্পর্শ করি। এখন প্রভাতের রবি মধ্য-গগনে এসে দাঁড়ালেও আর ভ্রুক্ষেপ নেই, ঘুম যেন আমায় পেয়ে বোসেচে।"

আমি—"তার কারণ আছে।"

শ্রীমতি—"কারণটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার?"

আমি—"দেখ, তখন সংসারে তুমি একা ছিলে, বাসনমাজা, ছড়াঝাঁট দেওয়া সংসারের যা কিছু কাজ নিজেই কর্‌তে। এখন ছড়াঝাঁটের জন্য ভাব্‌তে হয় না, বাসনমাজার জন্য ভাব্‌তে হয় না, রন্ধনের কাজ তাও বামুণে সারে।"

শ্রীমতি—"সই কিন্তু আর এক কথা বলেন।"

আমি—"কি বলেন!"

শ্রীমতি—"বলেন, ভগবান্ কষ্ট-জীবির জন্য নিদ্রার সৃষ্টি

করেননি। কারো কষ্ট মোচন না হোলে নিদ্রাকে কেউ পেতে পারে না।”

আমি—“সত্যি-কথা, অশান্তিকে আজ আমরা প্রকৃতই পদ-দলিত করত্তে পেরেচি।”

শ্রীমতি দ্বিরুক্তি করিল না। আমি তখন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত অনন্ত নীলাকাশ চন্দ্র-কর-গরিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু জ্যোৎস্নার প্রতিচ্ছায়া কলিকাতার রাজ-পথকে যে সম্পূর্ণরূপে উজ্জ্বল করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল এরূপ মনে হইল না। কলিকাতার একটা অসুবিধা এই, প্রকৃতির মাধুর্য্যতা সহসা নিরীক্ষিত হয় না। নিশীথে রাজপথে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে না চাহিলে আর পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে না। পথস্থিত বিজলীর হাজার হাজার শিখায় চন্দ্রের জ্যোতি যেন খদ্যোতে পরিণত করিয়া রাখে।

আজ বসন্তের পূর্ণিমা-নিশি। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের নন্দন কাননে দেবতাদের আজ বিরাট মহোৎসব। শুনি সেখানে মৃত্যু নাই, জরা নাই, অফুরন্ত হর্ষ, চিরবসন্ত বিরাজমান। তাই কি শশাঙ্কের এত রূপ!

কতক্ষণ প্রিয়াকে নিরীক্ষণ করি নাই। হঠাৎ দেখিলাম, জ্যোৎস্নাপরিসিক্ত হইয়া তাহার অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল অনন্ত-শোভায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। গর্ব্বিত নিশানাথের ক্ষমতা নাই যে, তাহার সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিয়া রাখে।

আবেগ সংবরণ করিতে পারিলাম না। সাদরে বক্ষে ধরিয়া

বলিলাম—"প্রিয়ে, তুমি বাস্তবিকই সুন্দরী। ভারতে আজ যদি নূরজাহান জীবিত থাক্‌তো, তুলনা কোরে দেখতুম কে বড়।"

আমি এ কথা ব্যক্ত করিলাম বটে; সে কিন্তু অধোমুখ করিয়া রহিল। শশব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"আচ্ছা, বল দেখি, সই তোমায় কত ভালবাসেন?"

শ্রীমতি বদন ঈষতুন্নত করিয়া বলিল—"আমি তা জানি না। আগে লেখাপড়া শিখি তারপর এ কথার জবাব তোমায় দোবো। এখন তুমি বল দেখি, ডাক্তারবাবু তোমায় কত ভালবাসেন?"

আমি বলিলাম—"সে কথা বাদ দাও, তাঁর ভালবাসা অসীম। জীবনে যদি কখনো দিন পাই তাঁর ঋণের কিঞ্চিৎও পরিশোধ কর্ব্বার চেষ্টা কর্ব্ব।"

শ্রীমতি আর প্রত্যুত্তর করিল না। অবসর বুঝিয়া আমি বলিলাম—"দেখ, আজকের পত্রিকায় বেশ একটা মজার গল্প পোড়লুম। ভাব্‌চি ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে তাই ঘ'ট্‌বে কি না!"

শ্রীমতি গল্পটি শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ জ্ঞাপন করিল। আমি বলিলাম—"দেখ, গল্পের নায়ক আমারই মতই একটা কাপুরুষ। নায়িকা তোমারই মত সুরূপা। নায়ক চাক্‌রী করেন হেন্‌রি কোম্পানির অফিসে, বেতন পান তিরিশ টাকা। নায়িকার ত' তাতে মন ওঠে না, সে চায় একটি গা গহনা। নায়ক দিতেও পারে না অথচ দোবো দোবো বোলে ভাঁড়াতেও ছাড়ে না। এদিকে পাশের বাড়ীর হীরালাল বোলে একজন লোক ছাদ থেকে

নায়িকাকে বলে—"ওগো সুন্দরী, তোমার অকর্মা স্বামিটিকে ত্যাগ কর, আমার হও, আমি তোমায় সোণায় মুড়ে রাখ্‌বো।" নায়িকা কিছুতেই তার কথায় রাজী হয় না, সে তার পাপ প্রস্তাবে পদাঘাত করে। হীরালাল ওই ধাতেরই লোক, সে কোনো কথাই শোনে না, নূতন উদ্যমে আবার পথ আগলে দাঁড়ায়। আগে সাজ-গোজ কোরে দেখা দিতো না, এখন সজ্জার কি বাহার! দিব্বি কুঁচোনো জরীপাড় ধুতি, চুনট করা পাঞ্জাবী জামা, কব্জিতে সোণার রিষ্ট-ওয়াচ, আঙ্গুলে হীরের আংটী, যেন জীবন্ত একটি কন্দর্প। নায়িকা এততেও বিচলিত হয় না, সে বারবারই প্রত্যাখ্যান করে। কন্দর্প সবতেই না-ছোড়-বান্দা, নোট ছুঁড়ে মারে, বুক যায় প্রাণ যায় রকমের বিরহ সঙ্গত বেঁধে গায়, চোখের জলে রুমাল ভেজায়, অনুরাগে বুক চাপড়ায়, সে এক বিভৎস চিত্র। এ দিকে নায়কের সেই তিরিশ টাকা বেতন নায়িকার ফাই-ফর্‌মাজের এক আনাও যোগাতে পারে না। নায়িকাও চটিতং হয়, মনের ঘেন্নায় অফিম খাবে কি গলায় দড়ি দেবে কিছুই সিদ্ধান্ত কর্‌তে না পেরে নায়ক তাকে প্রহার কর্‌তে সুরু করে। সে ভাবে—"এই তার মস্ত সুযোগ, তাকে পাবার জন্যে ধনবান্ হীরালাল হাত বাড়িয়ে বোসে রয়েচে, তার একটুখানি অনুগ্রহ লাভের জন্য সে লালায়িত, গরিব স্বামীর কাছে থেকে প্রহার খেয়ে তার লাভ কি?" শেষে নায়িকা তারই করগত হোলো।

শ্রীমতি গর্ব্বের সহিত বলিল—"হতভাগিনীর নরকেও স্থান হবে না।"

আমি বলিলাম—"তা না হোক্, উপস্থিত ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্ব্বে ত' ?"

শ্রীমতি নাসা কুঞ্চিৎ করিয়া বলিল—"এমন কলুষিত-ঐশ্বর্য্য যেন পৃথিবীর কোনো রমণীকে ভোগ কর্তে না হয়।"

শ্রীমতির উত্তেজনা বৃদ্ধির কারণ আমি বলিলাম—"ভাব্চি ভবিষ্যতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘ'ট্বে কি না।

আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইল না। অতি-নম্র মধুর স্বরে সে বলিল—"তুমি পাগল নাকি ?"

আমি বিস্মিত নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

৮

শনিবার, বেলা তিনটার আগেই আমাদের মাহিয়ানা হইয়া গেল। টাকাগুলি কোঁচার খুটে রীতিমতভাবে বন্ধন করিয়া নিরাপদে বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছুছিলাম। অমরেন্দ্রবাবু তখন পেসেণ্টের বাড়ী গিয়াছিলেন, শ্রীমতীকে ডাকিয়া টাকাগুলি তাঁহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলাম।

ধর্ম্মের কথা "কাঞ্চনকে যত শীঘ্র পার পরিত্যাগ কর।" কিন্তু সংসারবাসীর প্রতি এই উক্তি কতদূর প্রযোজ্য—উপদেষ্টাগণের নূতন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত ছিল। সংসারের যাহা পার্থিব বস্তু, সংসারী যাহাকে লাভ করিয়া চরিতার্থ হইয়া—শান্তির উপাদানে মাথা রাখিয়া নিদ্রা যায়, সেই রত্নকে অবাধে পরিত্যাগ করা সঙ্গত কি না আমি ত' ইহা ভাল বুঝি না।

কারণ অর্থই যে এ সংসারের মূলাধার। অর্থ ব্যতীত সংসার সুখের হয় না, দেবদেবীর পূজা করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করা যায় না, আসল কথা—

"অর্থ স্বর্গ, অর্থ ধর্ম্ম, অর্থহি পরমন্তপঃ।

প্রেমিকজন অমূল্য-জীবন অযাচিত ভাবে প্রিয়ার পদতলে উপহার দিয়াও হয় ত' তাহার মনোরঞ্জন করিতে পারে না,—তাহার প্রাণটিকে আয়ত্ব করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়, কিন্তু

অর্থ পদাঘাতের দ্বারা সেই কামিনীকে আপনার আঙ্গিনায় টানিয়া আনিয়া মনের সহিত সম্মিলন করাইয়া দেয়। অন্ততঃ এই বাহ্য জগতের উপভোগ্য স্বরূপ।

• আমি জগতের কাছে এই যে অনিয়ম বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতেছি, এজন্য হয় ত' ঘৃণার উপযোগ্য হইতে পারি; পরন্তু এ কথা অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা নির্ণয় করা চলে যে, আমি আমার সাধ্বী স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করিয়া একদিনও সে সুখ আয়ত্ব করিতে পারি নাই,—আজ কাঞ্চন আমায় যে সুখের অধিকারী করিয়াছে। সুতরাং পিতৃপিতামহের স্নেহের চেয়ে কাঞ্চনের স্নেহ অধিক বলকর।

আমি বরাবর আমার শয়ন-কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলাম। শ্রীমতি হাস্য উজ্জ্বল মুখখানি উন্নত করিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিল, আমি যাপরনাই সন্তোষলাভ করিলাম। কিন্তু বিস্ময় আমাকে অব্যাহতি দিল না, চিত্তকে সে বড়ই ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কই প্রিয়ার এমন উজল চাহনি ত' আমি একদিনও দেখি নাই। এমন মধুর সম্ভাষণ আমার কাণে ত' একদিনও পৌঁছায় নাই! আজ সে যেন আমায় সর্ব্বতোভাবে সন্তুষ্ট করিয়া, আমার পদসেবা করিয়া আমাকে সুনিদ্রার কোলে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে চায়। কই তাহার এমন ভাব ত' আমার চোখে একদিনও পড়ে নাই!

বলিহারী কাঞ্চনের মহিমা! সুরমা আঁকা আঁখির আহ্বান যেখানে নিষ্ফলে প্রত্যাগমন করে, ভ্রমর-কুঞ্চিত-কেশকলাপ যেখানে অকর্ম্মণ্য বলিয়া গৃহীত হয়, সুকণ্ঠের সুমধুর গীত যেখানে

মূক বলিয়া পরিগণিত,—কাঞ্চন সেইখানে কৃতিত্ব দর্শায়। ধন্য তুমি কাঞ্চন!

নিশীথ সময় প্রিয়ার সন্নিধানে বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। অনেক কথাবার্ত্তার পর চিরুণী তৈরীর ব্যবস্থা ধার্য্য করিয়া, সে নিদ্রা গেল।

প্রাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলাম। তখন অমরেন্দ্রবাবু কোনো এক বন্ধুর সহিত ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম ইতিহাসের কথা লইয়া বেশ বাদানুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতীতের কথা শুনিতে আমার খুব ভাল লাগিত। নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহাদের কথাগুলি শুনিতে লাগিলাম।

অমরেন্দ্রবাবু বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি যাই বল না কেন নরেশচন্দ্র, ইংরাজ যে পরাক্রান্ত জাতি এ কথা আমি কখনই অস্বীকার কর্ব্ব না?"

নরেশবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"তোমার কথা হয় ত' এই হিসেবে সত্যি হোতে পারে যে, দুর্ব্বল জাতির ওপর জুলুম করতে ওরা অভ্যস্ত বোলেই ওরা পরাক্রান্ত।"

অমরেন্দ্রবাবু—"ওই ইয়ারকিটুকুই শুধুই শিখে রেখেচে। মানুষকে মানুষ বোলে ভাব্‌বে না ত'—প্রবৃত্তি যে নিকৃষ্ট।"

নরেন্দ্রবাবু—"যা বোলেচ বন্ধু, তোমার প্রিয় বন্ধু ইংরাজ আগা-গোড়া খুব উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিই দেখিয়ে এসেচেন।"

অমরেন্দ্রবাবু—"তুমি ত' বরাবরই তাঁদের কুৎসা কর, কিন্তু ভেবে দেখ দেখি তাঁদের কি অসীম ত্যাগ স্বীকার,—কি কঠোর

সহিষ্ণুতা! এই ভারতবর্ষকে পাবার জন্য কত বড় বড় যুদ্ধ হোয়ে গেছে, মুসলমানরা কত পরাক্রম দেখিয়ে গেছে, বর্গীরা কত অত্যাচার কোরে গেছে, রাজপুতরা কত প্রাণ বলিদান দিয়ে গেছে, আর এঁরা সামান্য কয়জনে মিলে সুশৃঙ্খলে এটাকে করায়ত্ত্ব কোরেচে, মনে পড়ে কি নরেশবাবু?"

নরেন্দ্রবাবু—"মনে আবার পড়ে না দাদা, চতুর ক্লাইভকে ত' আগেই মনে পড়ে। আশ্চর্য্য তাঁর কৃতীত্ব। উমিচাঁদকে প্রতারিত কর্ব্বার জন্যে কি ফন্দিটাই না খাটিয়েছিলেন। ওয়াটসন সাহেব জাল পত্রে স্বাক্ষর কর্‌তে রাজী হোলেন না দেখে, তিনি নিজেই সে কাজটা সেরে নিলেন। কি মহত্ত্ব বল দেখি ভায়া? সেই সময় আমি একবার জ্যোতিষ্কমণ্ডলে ভ্রমণ কর্‌তে গেছলাম। গিয়ে দেখলুম, নন্দনকাননের পাশে প্রকাণ্ড একটা বিল্ডিং তৈরী হচ্চে, জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌তে পাল্লেম, কর্ণেল ক্লাইভ পরলোকে গিয়ে নাকি ওই খানেই বাস কর্ব্বেন।"

অমরেন্দ্রবাবু—"কি বাজে কথা বল্‌চ, এই সামান্য কারণের জন্য তুমি কি তাঁকেই অপরাধী মনে কর? আর সেই দুর্বৃত্ত উমিচাঁদ, যার কথা মনে পোড়লে রাগে সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে ওঠে, তার কথাটা কি একবার ভেবে দেখ না? ইংরাজ সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত কর্ব্বার সংকল্প কোরে, মির্জ্জাফরের সঙ্গে রফা কর্ব্বার জন্যে প্রথম সেই দুর্বৃত্তকেই মধ্যস্থ কোরেছিলেন কি না? সে সময় চণ্ডাল নিজের স্বার্থের দিকে না চেয়ে, যদি দেশের দিকে চেয়ে দেখ্‌তো, তিরিশ লক্ষ টাকার দ্বারা নিজের ধনাগার পুষ্ট কর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা

ত্যাগ কোরে—যদি সিংহাসনখানা বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌ত, কুমন্ত্রণার কথা নবাবের কর্ণগোচর কোরে দিত, ইংরাজ এত শীগ্‌গির কি কৃতকার্য্য হোতে পার্‌তেন ?

"তার পর ক্লাইভ যখন বুঝ্‌লেন, কাঁটা দিয়াই পায়ের কাঁটা তুল্‌তে হবে, বিশ্বাসঘাতকের সাহায্য ব্যতীত নবাবকে সহজে পরাস্ত করা যাবে না, বিশ্বাসঘাতককে হাতে রাখ্‌তেই হবে, সুতরাং তাঁর প্রতারণা করার প্রয়োজন হোয়েছিল। তিনি কার্য্যোদ্ধারের পর যদি সেই জাতিদ্রোহীর প্রতি সদ্ভাব কর্‌তেন, তাকে প্রতারণায় জর্জ্জরিত না কোরে—স্নেহের আবরণে ঢেকে রাখ্‌তেন, জালিয়াতির চেয়েও গুরুতর অন্যায় কাজ কর্‌তেন,—নরাধমের প্রায়শ্চিত্তের পথ কখনই এতটা সুগম হোতো না।

অমরেন্দ্রবাবুর বুদ্ধিমত্তার সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। ইতিহাসকে এমন রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করায় আমি সন্তোষলাভ করিলাম। আবেগে অস্ফুট-স্বরে বলিলাম—"বন্ধু, আশ্চর্য্য তোমার আলোচনার প্রভাব,—তুমি ভাগ্যবান্‌ !"

নরেশবাবু নততা স্বীকার করিলেন। বলিলেন—"কথাটার কতকাংশ সত্যি বটে,—উমিচাঁদ ব্যাটাই পাজী ; তা বোলে ওরা যে ত্যাগী বীরপুরুষ, পরের জন্য যে ওরা কষ্ট সহ্য কর্‌তে পারেন এ কথা আমি কখনই স্বীকার কর্ব্ব না।"

অমরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তা না কর, কিন্তু এক একজনের স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকা যায় কি ? ভাব দেখি ডাক্তার বৌটনের চরিত্র কথা ; তিনি সম্রাট

শাজাহানের অগ্নিদগ্ধা কন্যাকে আসন্ন মৃত্যুর কোল থেকে টেনে তুলে সম্রাট দরবারে কি সুযশই অর্জ্জন কোরে গেছেন? সম্রাট তাঁর প্রতি প্রসন্ন হোয়ে পারিতোষিক দিতে গেলেন, ইচ্ছা করলে তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ কোরে ইংলণ্ডে গিয়ে সুখে কালযাপন করতে পারতেন, কিন্তু তার বিনিময়ে তিনি প্রার্থনা করলেন স্বজাতির মঙ্গল কামনা,—অবাধ বাণিজ্যের অনুমতি। জাতির হিতার্থে এমন স্বার্থত্যাগ ইতিহাসে কয়টা মেলে?"

নরেশবাবু বলিলেন—"বটে, কিন্তু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দিয়ে তাঁরা কি ভাল কাজ কোরেছিলেন? যাঁরা বিশ্বাস-ঘাতককে সাদরে প্রশ্রয় দিতে পারেন, তাঁদের তুমি কি মনে করো।"

অমরেন্দ্রবাবু—"আমি তাঁদের খুব ভাল বোলেই মনে করি। যে ব্যক্তি আশ্রিত, অন্যের শত্রু হোক্ আর মিত্র হোক্ তাকে রক্ষা করাই তার কর্ত্তব্য। ভেবে দেখো এটা শাস্ত্রসঙ্গত কি না।"

নরেশ—"শাস্ত্রমতে হয় ত' উচিত হোতে পারে, কিন্তু নবাব যখন তাঁদের জানালেন কৃষ্ণদাসকে তাঁর হাতে অর্পণ করা হোক্, তাঁরা তা করলেন না কেন? এই দেশের আঙ্গিনায় বোসে, এঁদেরই ভূমির সত্বাধিকার লাভ কোরে—নবাবের আদেশ অমান্য করা তাঁদের উচিত হোয়েছিল কি, (?) প্রভুত্বের পরাকাষ্ঠা ত' খুবই দেখাচ্ছ, দুটো উচিত কথা বল ভায়া।"

অমরেন্দ্রনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন—"তোমাদের তর্কে পরাজিত করা অসম্ভব, আমাকে এখন পেসেণ্টের বাড়ী যেতে হবে, তর্কটা উপস্থিত স্থগিদ থাক।"

ভোলার ভ্রান্তি

আজ সাধের রবিবার, কেরাণীদের বিশ্রামের একটি স্মরণীয় দিন। আহারাদি শেষ করিয়া পান চর্ব্বন করিতে করিতে শয্যার উপর আসিয়া বসিলাম। প্রিয়তমার সহিত রসরঙ্গ করিবার এমন অবসর কেরাণীকুলের ভাগ্যে খুব কমই ঘটিয়া থাকে। তাহার সহিত দুটো মধুর আলাপ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইলাম। পাঁচ মিনিট গত হইল না, প্রিয়নাথবাবু আসিয়া আমায় ডাকিলেন। তিনি আমাদের অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। দ্বিপ্রহরে পথভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, আমাকেও তাঁহার সঙ্গী করিতে চাহিলেন। প্রিয়ার নিকট হইতে কয়েক ঘণ্টার জন্য বিদায় লইয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম।

প্রথমেই ত' মেছুয়া বাজারের মার্কেস্কোয়ারে গিয়া হাজির হইলাম। মাঠে বালক বালিকারা খেলা করিতেছিল। প্রিয়বাবুকে সম্বোধন করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে কি অভিপ্রায়ে আমাদের আগমন?"

প্রত্যুত্তরটা যেন তাঁহার ওষ্ঠাগ্রে যোগান ছিল। তিনি বলিলেন—"ভায়া, সারাদিন ত' গুদমের মধ্যেই পোচে মরি, খোলা পেয়ে দুনিয়াটাকে একবার ভাল কোরে দেখে নেওয়া উচিত।"

আমি আর অন্য কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, একটি ভদ্রলোক তিন চারি সের আন্দাজ তামাক, কতকগুলি থেলো হুঁকো ও ক্যাম্বিসের ব্যাগ লইয়া গাছ-তলায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রিয়নাথবাবু সেই ব্যক্তিকে দেখিয়া যেন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হে পরিতোষ, ব্যাপার কি? মাদকদ্রব্যের যে ভয়ানক আয়োজন দেখ্‌চি। বাড়ীতে কাজ-কর্ম্ম আছে বুঝি?"

তিনি সলজ্জভাবে মাথা নত করিয়া বলিলেন—"না ভাই, আমি একটা দোকান কোরেচি।"

প্রিয়বাবু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিসের দোকান হে, তামাক টিকের না কি?"

তিনি—"হুঁ,—প্রায় তাই বটে!"

প্রিয়বাবু—"আশ্চর্য্য কোল্লে দেখ্‌চি ভায়া, গ্রাজুয়েট উপাধি নিয়ে শেষে এই কীর্ত্তি কোরে বোস্‌লে? রোজগার করাই যদি দরকার হোয়েছিল একটা চাক্‌রী যোগাড় কোরে নিলে পার্ত্তে ত'।"

তিনি—"তার জন্যেও অনেক চেষ্টা করা হোয়েছিল দাদা! যেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েচি,—অল্পস্বল্প মুখভাঙ্গা সহ্য না কোরে আর ফিরিনি। একদিন এম্পায়ার কাগজ পোড়ে জান্‌তে পাল্লুম, লাল-দীঘির একটি সওদাগর অফিসে একজন কেরাণীর দরকার হোয়েচে, কর্ম্মিটি অন্ততঃ গ্রাজুয়েট হওয়া চাই। তুমি ত' জান আমি পিতার সর্ব্বস্ব ক্ষয় কোরে সে উপাধি আয়ত্ব কোরেছিলুম; সুতরাং প্রাতঃ-কালে আধপোড়া ভাত, একরত্তি ডাল আর দু'খানা আলুভাজা উদরস্থ কোরে ঊর্দ্ধশ্বাসে অফিসের গেটে গিয়ে খাড়া হোলুম। সে যেন বিরাট একটা মেলার ব্যাপার। যে দিকে দেখি সারি সারি লোকের মাথা, সকলের হাতেই এপ্লিকেশনের তাড়া, আর সকলের মুখেই ওই এক বুলি—"চাকুরিটি" চাই। ব্যাপার দেখে

হতাশ হোয়ে পোড়লুম, তবুও আশ্বাসটাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পাল্লুম না, ভিড় ঠেলে ভিতরে গিয়ে প্রবেশ কল্লুম। কিন্তু গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে না পৌঁছাতে দেখ্‌লুম, ওপর থেকে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হোলো, তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা—"নো-ভেকেন্‌সি।" যে মুখে গেলুম সেই মুখে ফিরে না এসে, যা থাক ভাগ্যে ব্যবসারই যোগাড় কোরে নিলুম। মান অপমান বড় ছোট বিবেচনা কোরে চল্‌বার দিন এখন আর নাই দাদা, জীবনকে বাঁচাতে হোলে অন্নের দরকার। দাসত্ব বৃত্তি পাবার আশায় দীর্ঘকাল অনাহারে থাকার চেয়ে,—দিন যদি চার আনা আয় হয় সেই ভাল।"

প্রিয়নাথবাবু কি মনে বুঝিলেন জানি না। কিন্তু আমি এই কথাগুলিকে অতি হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে করিলাম। তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া উভয়ে অন্যত্র গমন করিলাম।

আহারাদি করিয়াই বাটি হইতে বাহির হইয়াছিলাম। কাল মাহিয়ানা পাইয়াছি, আজ রবিবারের বাজার, আহারের মাত্রা খুব চরম হইয়া উঠিয়াছিল। বিডনষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া সোডারজল খাইয়া সুস্থ হইলাম।

প্রিয়বাবুর ইচ্ছা হইল তিনি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। বিরুদ্ধাচরণ করা আমার সাজে না; কারণ তিনি অফিসের বড়বাবু আর আমি তাঁহার অধীনস্থ ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী। আমায় যে তিনি দয়া করিয়া সঙ্গী করিয়াছেন এই যথেষ্ট।

উদ্যানমধ্যস্থ প্রান্তরের স্নিগ্ধ ছায়ায় শ্রান্ত দেহকে স্থাপিত করিয়া

দেশের কত অনাথ যে কি ভাবে বিরাজ করিতেছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কেহ আহারকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বিরামের জন্য অর্দ্ধশায়িত ভাবে আসীন, কেহ অনশনপীড়ায় কাতর হইয়া বিষণ্ণ মুখে ভাগ্য-চিন্তায় মগ্ন, কেহ রেশমের জামার উপর মট্‌কার উড়ানী উড়াইয়া ধূমপানে রত, কেহ তৃণ-শয্যার উপর অঞ্চল বিছাইয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত, কেহ কয়দিনে কত ব্যয় হইয়াছে, তহবিলে আর কত মজুদ আছে, হিসাব কষিতে বিব্রত, কেহ ত্রাহি মধুসূদন কি হবে দীনের গতি, বাজারে ধার মেলে না, চাকুরীর বাজার মন্দা ভাবিয়া চিন্তায় বিহ্বল, কেহ নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছে, কেহ তাহার পাদুকাজোড়া আত্মসাৎ করিবার জন্য পাশে বসিয়া এদিক ওদিক চাহিতেছে, চোগা চাপ্‌কান আঁটা পেয়াদা পিয়নবইখানা মাথায় দিয়া ঝোপের আড়ালে ঘুমাইতেছে,—এই সব দেখিয়া মনে হইল, মিউনিসিপ্যালিটির এই আশ্রয়টুকু এই অঞ্চলে যদি না থাকিত, কত লোকের যে ক্ষতি হইত বলা যায় না। নিষ্কর্ম্মা, গৃহত্যাগী, আলস্যের সম্রাট, সর্ব্ব লোকের অবজ্ঞেয়, লাঞ্ছনা যাহাদের অঙ্গের ভূষণ, অনাহার যাহাদের নিত্যব্রত, চুরি যাহাদের উপজীবি, আড্ডা যাহাদের প্রিয়, বাজারের অন্ন, পথের শয্যা, গঙ্গার স্নান আর গ্যাসের আলো নির্ব্বিচারে উপভোগ করাই যাহাদের ব্যক্তিগত অভ্যাস, তাহাদের মত ঘৃণিত কোনো ব্যক্তির আবশ্যক হইলে দ্বিপ্রহরে এই উদ্যানে আসিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। অকর্ম্মণ্যদের এমন প্রিয় বাসস্থান পৃথিবীর আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করিতে করিতে দিন অবসান হইয়া

আসিল। আগত রজনী অন্ধকারের আবরণ বিস্তীর্ণ করিয়া বিশ্বকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য যেন কতই ব্যগ্র। রজনীর এই অন্যায় আকাঙ্ক্ষা, এই নিষ্ঠুর গর্ব্ব-গরিমা, এই অসার দাম্ভিকতা কিসের জন্য ? পৃথিবী যাহাকে সুদৃষ্টি দিয়া দেখিতে চাহে না, যাহার নিবীড় কালিমামাখা বিভৎস চেহারাখানা ক্ষিতিতলের মস্ত বড় একটা বালাই—তাহার আবার গর্ব্ব কি ?

প্রিয়বাবু বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। আমি আগে হইতেই কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। এখন যত শীঘ্র পারি বাড়ীতে গিয়া পৌঁছাইতে পারিলেই বাঁচি।

কিন্তু কে জানিত অনতিদীর্ঘ অবসান-বেলা হইতে দুর্ভাগ্য তাহার দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়া, আমার গলা টিপিয়া হত্যা করিবার জন্য সন্ধ্যা উত্তীর্ণকাল পর্য্যন্ত আমারই অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহদ্বারে আততায়ীর বেশে দণ্ডায়মান। কে জানিত অন্তরীক্ষ হইতে সহসা এমন বিষাক্ত বাণী আমার কর্ণকুহরে আসিয়া শেল বিদ্ধ করিবে!

সদর দ্বার অতিক্রম করিয়া আসিয়াই বৃদ্ধ চাকরের মুখে শুনিলাম, বিকাল হইতে শ্রীমতির মাথা ধরিয়াছে। সে বড় সাধের সন্ধ্যা দেওয়া স্থগিদ রাখিয়া বিকাল হইতেই নাকি শয্যা-শায়িতা। কি করিব কিছু উপায় সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া—এক বোতল গোলাপজল আনাইয়া—তাহার কুণ্ডলীবদ্ধ কেশের গোড়ায় ঢালিয়া দিয়া তাহাকে পরিসিক্ত করিতে লাগিলাম।

কে জানে আমার এই প্রবল পরিশ্রম অকারণে পণ্ড হইয়া

আমার চিত্তকে দাবনলে দগ্ধিভূত করিয়া ফেলিবে কি না? পরিচর্য্যা করিতে আমি ত্রুটি করিলাম না। প্রিয়তমাকে আকস্মিক পীড়ার আক্রমণ হইতে টানিয়া উদ্ধার করাই ত প্রিয়তমের কার্য্য, আমি পারিব না কি ?

ভগবান এইবার বুঝি সন্তানের সন্তপ্ত প্রাণের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিলেন। কিছুক্ষণ শুশ্রূষা করিবার পর দেখিতে পাইলাম, রোগিণী ধীরে ধীরে চোখ উন্মিলন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে বেদানা ও আঙ্গুরের আয়োজন করিয়া দিবার জন্য আমি তাহার অনুমতি চাহিলাম। সে আমার সমুদয় প্রার্থনা অমঞ্জুর করিয়া দিয়া অতি ক্ষীণ করুণ-কণ্ঠে কেবল একগ্লাস জল চাহিল।

৯

আমাদের কি কু-অভ্যাস যে, সুখ-দুঃখ জীবন-পথের অস্থায়ী সম্পদ বলিয়া যেটাকে আমরা যখন হাত বাড়াইয়া পাই, সেইটাকেই জোর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া, হাসিতে হাসিতে নয় ত বা কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্ছ্বসিত উদ্বেগে অকুলপাথারে ভাসিয়া যাই। যেটা অদৃশ্য অন্ধকারের বহুদূরে তলাইয়া গিয়া, অশান্তির আবর্ত্তনে ফেলিয়া আমাদের ব্যথিত চিত্তকে মরণের মুখে তুলিয়া দেয়, সেইটার কবল হইতে আর কখনো মুক্তিলাভ করিতে পারিব না বলিয়া—আমরা হতাশের বেদনাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাই।

এইরূপ দুশ্চিন্তার বুকে পদাঘাত করাই আমাদের উচিত কি না? দুঃখের অপ্রতিহত সংগ্রামের নিবীড় অন্ধকারে আপনাকে হারা হইয়া—উষ্ণ অশ্রুধারা ঢালিয়া এই হৃদয়কে যে একদিন কতই সন্তপ্ত করিয়াছিলাম, সামান্য ফলওয়ালা অকথ্য ভাষায় সেও যে কত গালি দিয়াছিল, সেই অশান্তির সমুদ্র হইতে আমি কি আর কূলে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলাম না? যেটি যায় তাহার জন্য গিয়াছে বলিয়া রোদনের ধ্বনি না তুলিয়া সেইটিকে পাইবার জন্যই চেষ্টা করাই উচিত।

আমার পূর্ব্বজীবনের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। বেতনের হার দশটাকা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হাতে দু' পয়সা সঞ্চয়

হোক্ আর নাই হোক্ শ্রীমতিকে কতকটা ভূষিত করিতে পারিয়াছি। এমনি ভাবে দিন কয়টা কাটিয়া গেলে সুখের বাঁধন বুঝি আর বিচ্ছিন্ন হয় না। কিন্তু সময় যে বড় বালাই, সে আজ আমার,—কাল অপরের। আজ সে আমায় হাসায়, কাল সেই হাসি দলিত করিয়া তাহার গন্তব্যস্থানে ফিরিয়া যায়।

আজকাল অমরেন্দ্রবাবুর স্ত্রীর সহিত শ্রীমতির মনের বড়ই গরমিল দেখা যায়। দোষ কাহার বুঝিতে পারি না। কর্ত্রীর ইচ্ছা তাঁহাদের সোণার সংসার হইতে আমরা যতশীঘ্র পারি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাই। শ্রীমতিও সেই সব কথা তুলিয়া আমাকে অতিমাত্রায় ব্যস্ত করিয়া তুলে। একদিন অপরাহ্নবেলায় এই কথার মীমাংসা লইয়া উভয়ের মধ্যে খুব বচসা হইয়া গেল। মনটা রীতিমত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া অফিসের একজন বন্ধুর সহিত মতলব করিয়া সন্ধ্যার পর থিয়েটার দেখিতে গেলাম। ভাবিলাম নাটকের কিয়দংশ দেখিয়া রাত এগারটার আগেই বাড়ী ফিরিয়া আসিব।

রঙ্গালয়ে স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "রাণাপ্রতাপ" নাটক অভিনীত হইতেছিল। মেবারের দেব-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, মেবারেশ্বর রাণা প্রতাপসিংহ ওরফে সুরেন্দ্রবাবু গুরু-গম্ভীরস্বরে যখন আবৃত্তি করিলেন—"তোমরা শপথ কর,—শপথ কোরে বল যে যতদিন না জন্মভূমির উদ্ধার হয় তৃণ-শয্যায় শয়ন কর্ব্ব।" তারপর সেই স্থির সৌম্য প্রশান্ত পবিত্রপ্রাণ রাণার বাক্য সমর্থন করিয়া তাঁহার কয়েকজন স্বদেশবাসী যখন সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন,

তখন বাটীর কথা আমাদের স্মরণ ছিল কি না জানি না, মনে হইতেছিল, বিলাস-ব্যাভিচারপূর্ণ কলিকাতা মহানগরী হইতে আজ রাত্রের জন্য যেন আমরা রাজপুতনার সীমান্ত-ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি।

বাড়ীতে ফিরিতেই হইবে, কিন্তু কখন যে ফিরিতে পারিব, বাড়ীর দুয়ার খোলা পাইব কি না, পথে কোনো লালপাগড়ীর ইস্তাজারিতে পড়িয়া কিছু সেলামী দিতে হইবে কি না এ কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলাম। সুতরাং অভিনয় সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত আর বাড়ী যাওয়া ঘটিল না।

রাত্র দুইটার কিছু আগেই যবনিকা পড়িয়া গেল। বাড়ী যাইবার জন্য উভয়েই বিশেষ আগ্রহান্বিত হইলাম। রঙ্গালয়ের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, পুলিশের চুয়ান্ন আইনের বিভীষিকায় রাজপথ জনশূন্য। দুই বন্ধুতে সেণ্ট্রালএভিনিউরোড ধরিয়া বরাবর অগ্রসর হইলাম। ক্রমে মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট পার হইয়া চোরবাগানের ভিতর গিয়া পড়িলাম। চোরবাগানে আমাদের বাসা ছিল কিন্তু চুরিবিদ্যা আমাদের উপজীবিকা ছিল না। বন্ধু ছিলেন সওদাগরী অফিসের কেরাণী—আর আমি হোরমিলার কোম্পানির গুদমজাত মাল।

মুক্তরাম রো পার হইয়া উভয়ে ত' বাটীর সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বাটীতে ডাক্তারবাবুর একটি সেকেলে বৃদ্ধ চাকর ছিল। মহাপ্রভু আবার কিঞ্চিৎ মাত্রা অহিফেণ সেবন করিতেন, গভীর রাত্রে ভীষণ ডাকাতি হইয়া গেলেও বেচারীর ঘুম ভাঙ্গিত কি না সন্দেহ। এরূপস্থলে জানালা দিয়া যে তাহাকে ডাকিয়া

তুলিতে পারিব এ আশা নাই। হাঁকাহাঁকি করিয়া সকলের শান্তি ভঙ্গ করার চেয়ে পরামর্শ করিয়া দুজনে মহৎ আশ্রমের রোয়াকে গিয়া বসিলাম।

বন্ধুবর সওদাগর অফিসের কেরাণীবাবু, সাহেবের অনুপস্থিতিতে অফিসের চেয়ারে পা ছড়াইয়া দিয়া অনেক সময়ই তিনি বিশ্রামলাভ করিয়া থাকেন। গোরমিলার কোম্পানির গারদখানার কর্ম্মচারীদের ভাগ্যে সে সুযোগ বড় ঘটিয়া উঠে না। কাজেই কোঁচার দ্বারা গা আবৃত করিয়া আমি রোয়াকের উপর চিৎপটাং হইলাম, তিনি সুষুপ্ত-ধরা কাঁপাইয়া প্রতাপের অভিনয়ের আবৃত্তি করিতে সুরু করিলেন।

স্তব্ধ-রাত্রে প্রতাপের পরোকাষ্ঠা লইয়া বন্ধু কতক্ষণ যে বসু-মাতাকে জ্বালাতন করিয়াছিলেন তাহা আমি জানিতাম না, শয়নের পরই আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম। সহসা ধাক্কা খাইয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে দিনরাতের উদ্দেশে প্রণাম করিতে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ হাতের উপর খটাং করিয়া কি একটা আঘাত করিল। দিননাথকে প্রণাম করা আমার নিত্য-পদ্ধতি ছিল। সবিস্ময়ে চোক মিলিয়া দেখি,—হায়, কোথায় আমার সেই প্রভাতের দিননাথ, এ যে প্রাণনাথ পাহারওয়ালা। শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকেই প্রণাম করিলাম। দিননাথকে স্মরণ করিবার কথা আজ আর আমার মনে পড়িল না। ধর্ম্মকর্ম্ম যেন তাহার লাঠির তলায় সভয়ে আত্মগোপন করিয়া রহিল।

আমি উঠিয়া বসিতেই লালপাগড়ী জিজ্ঞাসা করিল—"তুম্ কোন্ হায় ?"

আমি সরল বাংলা ভাষায় বলিলাম—"আমরা বাঙ্গালী, দুজনে থিয়েটার দেখ্‌তে গেছলুম, বাড়ীর দোর খোলা না পেয়ে এই খানে অপেক্ষা কচ্চি। আমাদের কোনো মন্দ উদ্দেশ্য নাই।"

লালপাগড়ী তাহার স্বাভাবিক ভাষায় গালিবর্ষণ করিয়া বলিল—"তোম্ শেড়ুয়ালোক ডাকু হ্যায়, আভি থানেমে জানে পড়েগা।"

লালপাগড়ী এত সহজে যে আমাদের কি প্রকারে চোর সাব্যস্ত করিল বুঝিতে পারিলাম না। জানি এ ব্যক্তি পুলিসের কর্ম্মচারী, কিন্তু এর চেয়ে অনেক উচ্চে আমাদের স্থান। আমরা যে মজলিসে বসিয়া এদের ন্যায় দু'একজনকে প্রত্যহই চোখ রাঙিয়ে থাকি, দেওয়ালি ও হোলির পার্ব্বনির জন্য আমাদের কাছে যাহারা অবনত শিরে কৃতজ্ঞতা জানায়, সেই জাতীয় লোক আজ আমাদের অকারণে চোর সাব্যস্ত করিতেছে। এর চেয়ে মরণই আমাদের ভাল।

পরে কথা প্রসঙ্গে জানিতে পারিলাম, ইহার মধ্যে বন্ধুরও খুব অন্যায় হইয়াছে। এই নিশুতি রাত্রে থিয়েরটারের আবৃত্তি তিনি না করিলেই ভাল করিতেন। তিনিও মেদিনী কাঁপাইয়া রীতিমত এক্ট করিতেছিলেন, পার্শ্বভাগ হইতে আমারও ঘন ঘন নাসিকা গর্জ্জন হইতেছিল, ইত্যবসরে দণ্ডধারী লালপাগড়ীরও সমাগম হইল। ইহাও তদধিক দোষের কারণ দাঁড়ায় নাই; বন্ধুবর নাকি তাহাকে বলিয়াছে, আমরা বিবাহ-বাড়ী লৌকিকতা রাখিতে গিয়াছিলাম, পরে আমি বলিলাম থিয়েটার দেখার কথা, কাজেই সে বেচারা আমাদের সন্দেহের চক্ষে দেখিল।

আমি সরল ভাবে বুঝাইয়া বলিলাম—"দেখ ভাই, বন্ধু ভয়ে তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলেচে। আমরা বাস্তবিকই থিয়েটার দেখ্‌তে গেছলাম। আমাদের অভদ্র মনে কোরোনা।"

বেচারা কোনো কথাই শুনিল না, সক্রোধে লাঠি দেখাইয়া বলিল—"আরে চুপ্‌চাপসে চলিয়ো, আভি ডাণ্ডাসে ভদ্দর বন্ যাওগে। শেড়্‌য়াকো নাতি ভদ্দর হ্যায়।"

নরাধমের কটুভাষা শুনিয়া ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। মনে করিলাম, দুর্ব্বৃত্তের হস্তস্থিত লাঠি গাছটি সবলে ছিনাইয়া লইয়া মস্তকে রীতিমত দু'চার ঘা বসান দি, হতভাগা রক্তাক্ত দেহে ধরাশায়ী হোক্। কিন্তু উৎসাহ বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না।

চিন্তা করিয়া দেখিলাম, নররূপী এই বিধাতাপুরুষের কিঞ্চিৎ পূজা দেওয়া চাই। বন্ধুকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার কাছে পারিতোষিক কিছু আছে কি না? তিনি ইঙ্গিতে জানাইলেন, একটি আধপয়সাও নাই।

লালপাগড়ীর আশালুব্ধ চাহনি আমাদের পকেটের উপরই ন্যস্ত ছিল। কিছু পাইলেই সে যেন আমাদের মুক্তি দেয়। জামার পকেট অন্বেষণ করিয়া চারিটি পয়সা পাইলাম। কিন্তু বুভুক্ষিত বীরপুরুষের বিরাট ক্ষুধা এই সামান্য আহারে নিবৃত্তি হইবে কি? পয়সা কয়টি লইয়া করযোড়ে তাহার হাতের সহিত আমার হাত ভিড়াইয়া দিলাম।

পয়সাগুলি সে কিছুতেই নিল না। বোধ হয় এই অল্প উপঢৌকন গ্রহণ করিতে তাহার মন প্রবৃত্ত নয়। অপরির্য্যাপ্ত গালি-

বর্ষণ করিয়া আমাদের পিতৃপুরুষকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিল। নরাধমের সহিত বাক্-বিতণ্ডায় কোনো সুফল নাই, বন্ধুসহ থানায় যাইতেই স্বীকৃত হইলাম।

থানায় আসিয়া দেখিলাম, দেউড়ীর পাশে "দরজা" বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাইতেছে। আমাদের লালপাগড়ী তাহাকে সজাগ করিয়া মুন্সিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিল।

সে ব্যক্তি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া লালপাগড়ীকে আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

লালপাগড়ী তাহাদের দেশোয়ালী ভাষায় যে কথা বলিল, তাহার প্রত্যুত্তরে সে বলিল—"হাল মালুম হো চুকা, শেড়ুয়া লোক পহেলা নম্বর ডাকু হ্যায়।"

বরাবর অফিস ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ঘরের মধ্যে কেহই ছিল না। বারদিক হইতে কেবল ঘন ঘন নাসিকা গর্জ্জন শ্রুত হইতেছিল। মনে হইল মহাবীর কুম্ভকর্ণের বংশধরগণ আজিকার জন্য বুঝি এই থানায় আসিয়াই আবির্ভূত হইয়াছেন। টেবিলের চারি পার্শ্বে অনেকগুলি চেয়ার সাজান ছিল। বন্ধুর চেয়ারে বসাই অভ্যাস, সম্মুখ হইতে চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া বসিতে উদ্যত হইলেন। লালপাগড়ী তাহাকে বাধা দিয়া বলিল—"কুর্সীমে বৈঠনেকো হুকুম নেহি।" তার পর "লাঠির গুঁতোয় এখনি ঠাণ্ডা করিয়া দিবে, গারদে পচাইয়া মারিবে"—এই কথা বলিয়া মুন্সি-বাবুকে জাগাইয়া তুলিল।

মুন্সি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার তন্দ্রা

নিমীলিত চক্ষু তখনও ভালরূপে উন্মুক্ত হয় নাই। মুখভঙ্গি বিকৃতি করিয়া, বিরাট হাই তুলিয়া, আমাদের দিকে চাহিয়া "আমি ও আমার বাহান্ন পুরুষ কে কোথায় আছেন, তাঁদের উপজীবিকা কি, আমি কি করি, আর কখনো জেল খাটিয়াছি কি না" এই সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

আমরা কোনো কথারই উত্তর দিলাম না। তিনিও উত্তরের আশা করিয়া বোধ হয় কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই। ডাইরি বহিতে আমাদের নাম লিখিয়া লইলেন।

পরক্ষণে অতিশয় রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোরা মাল-টাল টানিস্ ?"

এই "তুই" শব্দ শুনিয়া প্রথমে আমার বাল্যজীবনের স্মৃতি মনে উদিত হইল। তখন দুষ্টামি করিলে পিতা মাতা বা গুরুর নিকটই এই শব্দ শুনা যাইত। বর্ত্তমানে অতি প্রিয়বন্ধু যে তিনিই এই শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অকারণে অপরিচিত এই মুন্সি-বাবুও যে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন—ইহা আজ জানিলাম।

লালপাগড়ী বেচারা সুদক্ষ কর্ম্মবীর বটে, আমরা কোনো কথা প্রকাশ করিবার আগেই, সে তাহার স্বকল্পিত মিথ্যা কথার দ্বারা আমাদের এমন দূষি সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল যে, দয়াবান্ মুন্সিও তাহার কথা সত্য বলিয়া অনুমান করিলেন। চৌর্য্যবৃত্তিই যেন আমাদের পেশা।

এ স্থলে কোনো বাদানুবাদ করাই সমীচীন নহে। উচিত কথা বলিলে রাজশক্তির প্রতি হয় ত' অসম্মান করা হইবে। এদের

প্রয়োজন হইলে আমাদের সন্তপ্ত দেহের উপর আগুন জ্বালিয়া এরা রন্ধনাদি নির্ব্বাহ করিতে পারে, আমাদের চতুর্দ্দশ পুরুষের আত্মশ্রাদ্ধ করিয়া সম্মানের প্রতি আঘাত করিতে পারে, তথাপি আমাদের বলিবার কিছু নাই,—যে হেতু আমরা নির্য্যাতিত জাতি।

আমাদের ডাইরী লেখা শেষ হইবার পরই কনেষ্টবল আরো কয়েকজন আসামীকে লইয়া হাজির করিল। ইহাদের মধ্যে আমার একজন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলাম। ইনি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ, আমাদের বাটীর পুরোহিত ঠাকুর। অশীতীবর্ষীয় ব্রাহ্মণ, শুভ্রকেশ, মুণ্ডিত গুম্ফ, গায়ে নামাবলি, পায়ে কাষ্ঠপাদুকা, বুঝিতে পারিলাম না ইনি কোন্ অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। পুলিশের এই দুর্ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, দুর্ব্বল জাতিকে অকারণে পদদলিত করাই বুঝি ইহাদের পদ্ধতি।

প্রথমে খুবই বিস্ময় উৎপাদন করিল। কিন্তু নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া ব্যাপারটা তলাইয়া বুঝিতে আর বেশী দেরী হইল না। আজকাল পুলিশের হাতে পড়িয়া এইরূপ অনেককেই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আমরা যে অপরাধে ধৃত হইয়া ঘৃণিত জীবনকে আজ নিতান্তই কলুষিত বলিয়া মনে করিতেছি, এই ব্রাহ্মণও বোধ হয় সেইরূপ কোনো কারণে এই হৃদয়হীনদের হাতে পড়িয়া আত্মসম্মান খোয়াইতে বসিয়াছেন। মুন্সি তাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়া ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"কিরে বাপ্পা, রাত দুপুরে যে সিন্নির চেষ্টায় বেরিয়েছিলি ব্যাওরাটা কি? লুকোনো গিন্নি-টিন্নি আছে বুঝি?"

ব্রাহ্মণ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"ধর্ম্ম অবতার, এই বর্ণগুরু

ব্রাহ্মণ আজ আর তোমাদের কেউ নয়। নইলে সারাদিন আমি উপবাসী, যজমান বাড়ী থেকে এই মাত্র ফির্‌চি, নারায়ণ এখনো আমার সঙ্গে রয়েচেন, এই দুর্ব্বৃত্ত চৌকিদারটা আমায় ধোরে নিয়ে এলো কেন, তুমিই বা আমার প্রতি এতটা রুষ্ট কেন?"

ব্রাহ্মণের এই শ্লেষ বাক্য শুনিয়া অশ্রু যে কি প্রকারে সংবরণ করিয়া থাকা যায় তাহা এই পদদলিত বাঙ্গালী জাতীই জানে। বুঝি বা বঙ্গের বাহিরের অসভ্য পার্ব্বত্য জাতীরাও এতটা সহ্য করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না।

মুন্সি ব্রাহ্মণের করুণোক্তির প্রতি আদৌ কর্ণপাত করিলেন না। তিনি নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"বাপ্পারে, অমন ভণ্ডামি আমরা অনেকই দেখে থাকি। ও সব বুজরুকি চাল গিন্নিকে গিয়ে শুনিয়ো। পরক্ষণে লালপাগড়ীকে ডাকিয়া বলিলেন—"তল্লাস কোরে দেখ ব্যাটার কাছে কি পাওয়া যায়।"

ব্রাহ্মণ করযোড় করিয়া বলিলেন—"আমায় ছুঁতে নিষেধ কর বাবা, আমার সঙ্গে নারায়ণ আছেন।"

এই বর্ব্বরতা আর কতক্ষণ দেখা যায়! মনে করিলাম, নরাধমকে আসন হইতে এখনি গলা টিপিয়া নামাইয়া দি। কিন্তু পিছন দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—বলিষ্ঠ দণ্ডধারী দণ্ডায়মান, সভয়ে আবেগ প্রশমিত করিয়া লইলাম।

আসামীগণের মধ্যে একজন সুরাপায়ী ব্যক্তি ছিল। তাহার অসভ্য বাক্‌বিতণ্ডা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা কঠিন। বেচারা প্রথমেই ত' এক দীর্ঘ প্রণামের ব্যবস্থা করিল। লালপাগড়ী চুপ

করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বলায়, তাহাকে ধাক্কা মারিয়া সে বলিল—"চোপ্‌রাও ব্যাটা ছুঁচো, আমি আমার আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে এলুম, তুই ব্যাটা বিশ টাকা মাইনের বান্দা, আমার ওপর চাল মার্‌বি কি রে ব্যাটা !"—

মুন্সি মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"চুপ্‌রহ সম্বন্ধি।"

মাতাল বলিল,—"বেভুল কথা বোল্‌চ কেন বাবা, আমি যে সম্বন্ধির ভাগ্‌না, চিন্তে পাচ্চনা আমায় ? যা হোক্ বাবা, বড়লোক হোয়ে খুব ভোল ফিরিয়ে বোসেচ। কিন্তু যাই ভাব না কেন, দয়া কোরে যখন চরণ দর্শন পেয়েচি, অন্ততঃ আটটা দিন ত' এখান থেকে নড়চিনি বাবা !"

মুন্সি—"তোর নাম কি ?"

মাতাল—"তিনকড়ি, কিন্তু বিন্দি বেটি আমায় 'তিনে' 'তিনে' বোলে ডাকে, ডাইরীতে ওটাও লিখে নাও।"

মুন্সি—"বিন্দি কে ?"

মাতাল—"তোমার বৌমা গো বাবা !"

মুন্সি—"চুপ্‌রহ।"

মাতাল—"তা কি হয় প্রাণধন ! এদ্দিনের পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা, দুটো রসভাষ না কোয়ে থাকৃতে পারি কি ? দুনিয়া যে আমায় বেরসিক বোল্‌বে।"

মুন্সি—"চুপ্‌রহ, বাড়ী কোথা বল।"

মাতাল—"ওই বিন্দির বাড়ীতেই।"

মুন্সি—"বিন্দি কি তোর উপপত্নী ?"

মাতাল—"জেনে শুনে আবার ন্যাকামি কর কেন বাবা, সম্বন্ধ বাঁচিয়ে কথা বোল্লে ভাল হয় না ?"

মুন্সি—"শালার ব্যাটা শালা ! শীগ্‌গির বল বিন্দি তোর উপপত্নী না বিবাহিতা ?"

মাতাল—"শোনো বাবা, আরজন্মে সে আমার বিবাহিতাই ছিল। তারপর একটা জন্ম উত্‌রে গেছে বোলে, এ জন্মে উপপত্নীই হোয়েচে। তোমার ধর্ব্বার তারিফ আছে দেখ্‌চি বাবা।"

মুন্সি—"কতটা মাল টেনেচিস ?"

মাতাল—"বাবা সে কথা আর জিজ্ঞেস্ কোরো না, মাত্র একটি পাঁট। দেখ বাবা, এ দিকে যা হবার তা ত' হোলোই, তোমার মেয়ের নাকচোনাটি পর্য্যন্ত বেচে মদ খেলুম, এর ওপর আবার তুমি টানাটানি লাগাচ্চ কেন বাবা ! আমি যদি তুমি হোতুম, আর তুমি যদি আমি হোতে, আমি এতক্ষণ কিছুতেই তোমায় দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দিতুম না, কিছু না হোক্ অন্ততঃ গলা জড়িয়ে ধোরে কেঁদে ফেল্‌তুম।"

মুন্সি দ্বিরুক্তি না করিয়া সকলকেই হাজতে লইয়া যাইতে বলিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় ব্রাহ্মণের মুচলেখা লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

আমরা সকলেই এক ঘরে নীত হইলাম। মাতাল বেচারা তখনও তাহার ভণ্ডামির বেগ সংবরণ করিতে পারিল না। বিকট চীৎকার করিয়া সে বলিল—"বাবা হে, বেশ চমৎকার আড্ডাটি

হোয়েচে বাবা, একটা ছোট বালিশ আর এক ক'ল্‌কে তামাক হোলেই আসরটা জমে।"

বেয়াদপ মাতালটাকে বেশীক্ষণ আর চীৎকার করিতে হইল না। নেশাঘোরে অবসন্ন দেহ ভূমি-শয্যায় ঢালিয়া দিয়া সে নিশ্চিন্ত ভাবে নিদ্রা গেল।

নিশাবসান হইতে বেশী বিলম্ব ছিল না। প্রভাতের অস্পষ্ট অরুণ-রাগ গারদের সংকীর্ণ পথ দিয়া মেঝের উপর আসিয়া প্রতিফলিত হইল।

পুলিশের বেয়াদপির কথা চিন্তা করিয়া যাতনায় অধীর হইয়া পড়িলাম। ক্ষত-দেহের ব্যথার মত একটা সতীব্র বেদনা, অপরাধীর দণ্ডের মত একটা গুরুতর যাতনা, আগ্নেয়-শিখরের তরল অগ্নি-স্রোতের ন্যায় একটা জ্বলন্ত প্রবাহ অন্তরাত্মাকে যেন ভীষণ জ্বালাময় করিয়া তুলিল। নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারিলাম না, আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল নিরীহ ব্যক্তিকে অকারণে ধরিয়া আনিয়া পুলিশের কি স্বার্থ সাধিত হয়। কারাগারের তস্করগণের সহিত আবদ্ধ করিয়া আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখাই বোধ হয় তাহাদের ইচ্ছা।

সঙ্গীগণ সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। মিউনিসিপ্যালিটির ময়লাফেলা গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ বা দূরাগত কাক-পক্ষীর উচ্চ কলরব তাহাদের নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে পারিল না। অপরিচ্ছন্ন কারা-কক্ষের সিক্ত ভূমি-শয্যায় অঞ্চল বিছাইয়া মানুষ যে কোন্ সুখে নিদ্রা যায় কে জানে! এই দুঃখময় রজনী

কেবল আমরাই জাগিয়া কাটাইয়া দিলাম। সতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গারদখানার চারিদিক্‌টা একবার ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইলাম। নীচে ইটের খাদিগাঁথা বিস্তৃত চাতাল, উপরে তারে ঝোলান ইলেক্‌ট্রিকের ডুম, দেওয়ালগাত্র নানারূপ ময়লা ও নিষ্ঠীবন ত্যাগের বিচিত্র-চিত্রে চিত্রিত এবং তীব্র দুর্গন্ধে তাহার চারিদিকটা পরিপূর্ণ। ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া রহিলাম। গারদের জানালার ফাঁক দিয়া—আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সারি গাঁথা রাঙ্গা মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া দিনমনি ধীরে ধীরে অভ্যুদয় হইতেছেন। বন্ধুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—চিন্তাকালিমা তাহার মুখমণ্ডলকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। তাহাকে উৎসাহিত করিয়া আমি বলিলাম—"ভাব্‌না কিরে বিনোদ, এই ত' সবে মাত্র আমরা হাজতে এসে দাঁড়িয়েচি, এরপর যদি আলিপুরের জেলে গিয়ে পাথর ভাংতে হয় তার জন্যও প্রস্তুত হোয়ে থাক্‌তে হবে।"

তাহার নাম বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। সে অতি ঘৃণাব্যঞ্জক-স্বরে বলিল—"পুলিশের লোকের কি অন্যায় বল্ দেখি? আমরা অপরাধী নয়, পাহারওয়ালাটাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পাল্লুম না বোলে এই দুর্গতি হোলো। এরপর বিচারকর্ত্তা কি কর্ব্বেন তিনিই জানেন, হয় ত' জেলই আমাদের অদৃষ্টে আছে।"

আমি বলিলাম—"হয় ত' কেন, সেইটাকেই সত্যি বোলে মনে কোরে রাখ। ওরা সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা যতটুকু সঙ্কুলন কর্‌তে পারে—তাতে দোষটাই প্রতিপন্ন হোয়ে থাকে। নিরপরাধী হোক্,

ধাৰ্ম্মিক হোক্, সে তার ঘরে আছে, ওদের কর্ত্তব্য পালন ওরা কর্ব্বেই। শুনিস্‌নি কি যে, রাজ্যে ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই ওদের যত চেষ্টা?”

বিনোদ—“এরই নাম কি ধর্ম্মের মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখা?—এরই নাম কি ন্যায় বিচার? যে নরাধম ক্ষুধার্ত্তের মুখের গ্রাস নিঃশঙ্কোচে কেড়ে নেয়, দু'খানা গহনার জন্য ললনার প্রাণ সংহার করে, ক্ষুদ্র শিশুর উপর যথেচ্ছাচরণ কর্‌তে কুণ্ঠিত হয় না, তার প্রতি ছ'মাসের কারাবাসের আদেশ দিয়েই বিচারক যে আইন বইখানা আল্‌মারিতে বন্ধ করেন, এটা তাঁর কতদূর ন্যায় রীতি? হয় ত' এই বিচারই ঠিক আইনের নির্দ্দেশ হোতে পারে, কিন্তু অপরাধী এতে কতটুকু শাস্তি অনুভব করে? সে গারদখানায় বোসে জেলার সাহেবের উদ্দেশে হয় গালিবর্ষণ কোরে দিন কাটায়,—নয় ত' ঘানি ঘুরিয়ে জেল-বাণিজ্যের পসার বৃদ্ধি কোরে নিরাপদে বাড়ীতে ফিরে আসে।”

আমি—“এ বিষয়ে বিচারকের দোষ দেখ্‌তে গেলে চলে না। বিচারটা আইনের নিগড়ে ষোলআনা বাঁধা পোড়ে আছে। ব্যবহারজীবির অমূলক প্রতিবাদ তাঁদের মাথাটাকে এমনই বিকৃত কোরে রাখে, আইনের শেকল তাঁদের এমন শক্ত কোরে বেঁধে রেখেচে, সত্য মিথ্যা ভেবে বিচার কর্ব্বার শক্তি তাঁদের থাকে না। হয় ত' অপরাধের জন্য যার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত আইন তাকে নিরাপদে বাঁচিয়ে দেয়, আর যে মুক্তির পাত্র তাকে দণ্ড নিয়ে আজীবন কেঁদে কাটাতে হয়।”

বিনোদ উত্তেজিত হইয়া বলিল—"এই বদ্ধ কারাগারে দাঁড়িয়ে আমি স্পষ্টই বল্‌চি, বিচারের সময় ধনবান্ বাদীর নালিশটা কয়েক মিনিটের জন্য চাপা দিয়ে রেখে, বিচারক যদি গরীব আসামীর অন্তরের ভিতরে গিয়ে দাঁড়ান, যদি তার অন্তরে কি মর্ম্মস্পর্শী সত্য সন্নিহিত রয়েচে বিচার কোরে দেখেন, তিনি বুঝ্‌বেন ধর্ম্মহীন বাদী মিথ্যাজাল পেতে গরীবকে মার্‌বার কি সুন্দর অভিসন্ধি এঁটে বেরিয়েচেন,—দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য সেই বাদী—না সেই নিরীহ আসামী।"

বিনোদের কথা শুনিতে শুনিতে প্রাণ অনুরাগে ভরিয়া উঠিল। আবেগে পুলিস-কর্ম্মচারীদের কত তিরস্কার করিতে ইচ্ছা হইল। মানুষ এই ইচ্ছাকে দমন করিতে না পারিয়াই হত্যাকাণ্ড করিয়া বসে,—নরকের দ্বার সে স্বহস্তে উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

বিনোদকে নির্দ্দেশ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রাতঃকালে যে কোমরে দড়ি পোড়বে, তা'র সম্বন্ধে কি ভাব্‌চ ?"

বিনোদ রুষ্ট আগ্রহে বলিল—"তার সম্বন্ধে ভগবান্‌কে জানাচ্চি। জানি না এই নিষ্ঠুর অত্যাচার আর আমাদের কতদিন সহ্য কর্‌তে হবে। জানি না ঈশ্বরের কাছে আমরা কি এমন গুরুতর অপরাধ কোরেচি।"

উভয়ের কথাবার্ত্তা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। গারদ ঘরের চাবিবদ্ধ দরজার পাশ হইতে একজন লালপাগড়ি চীৎকার করিয়া আমাদের বলিল—"কাহে তোম্‌লোক বড়র্ বড়র্ কর্‌তা হ্যায়,—চুপ্ রহ।"

ভয়ে অনুরাগটা অন্তরের মধ্যে আস্তানা গাড়িয়া চাপিয়া বসিল। আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চায়ি করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

দিনের আলো চারিদিক্‌টাকে বেশ সুস্পষ্ট করিয়া তুলিল। কয়েদীরা কেহ লুকানো অৰ্দ্ধদগ্ধ বিঁড়ি বাহির করিয়া ধূমপান করিতে লাগিল, কেহ গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিয়া গবাক্ষের ছিদ্র দিয়া রাজপথ দেখিতে লাগিল, কেহ প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিবার জন্য চৌকিদারকে হাঁক পাড়িয়া ডাকিতে লাগিল, অধিকাংশ লোকের মুখেই একটু না একটু প্রসন্নতার আভা জাজ্জ্বল্যমান। আমরা নির্ব্বাক হইয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম। একজন হিন্দুস্থানী খাবারওয়ালা আসিয়া প্রত্যেককে তিন চারি খানি আন্দাজ আধপোড়া রুটি, অল্প আলুর তরকারি ও আধ-ছটাক আন্দাজ হালুয়া বণ্টন করিয়া সকলের তৃপ্তি সাধন করিয়া গেল। আমরা তাহাদের খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে প্রথমে অসম্মত হইয়াছিলাম। একজন কাণের নিকট মুখ আনিয়া বলিল—"খাবারগুলো ছাড়বেন না মশায়, না হয়—" বলিয়া আমাদের মুখের দিকে সে করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। খাবারগুলি গ্রহণ করিয়া তাহাকে দিলাম।

খাবারগুলি উপাদেয় কি অখাদ্য কে জানে, তাহারা অতি আগ্রহের সহিত উদরস্থ করিতে লাগিল। তাহাদের মনের হাব-ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল, এই বন্ধনদশার জন্য তাহারা বিশেষ কাতর নহে। তস্কররা এই জন্যই বোধ হয় ইহাকে শ্বশুরালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে।

অবাক্ হইয়া তাহাদের কার্য্যবিধি পরিদর্শন করিতেছিলাম। হঠাৎ অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া সম্মুখে হাজির হইলেন। বিনোদের জ্যেষ্ঠ সহোদর সুধীরবাবুও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। অজানা অন্ধকার-পথে যাত্রা করিতে করিতে অদূরে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিয়া পথিকের প্রাণ যেমন আশার আবেগে বিহ্বল হইয়া পড়ে, অমরেন্দ্রবাবু ও সুধীরবাবুর উপস্থিতিতে সেইরূপ একটা জীবন্ত উত্তেজনায় উজ্জীবিত হইয়া আমরা মুক্তির প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম।

১০

অমরেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে হাজত-গৃহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, হারান জীবনটাকে অশান্তপুরীর মধ্যে আবার যেন খুঁজিয়া পাইলাম। হৃদয়টাকে রীতিমত ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম,—অজ্ঞাত আশঙ্কার অব্যাহত স্পন্দনের তীব্র বেগটা অনেকটা যেন প্রশমিত হইয়াছে;—যেন জ্বালাময় প্রকোষ্ঠের যাতনার আবরণ ভেদ করিয়া প্রফুল্ল অন্তরে আবার আমি শান্তির ছায়াতলে আসিয়া নীত হইলাম।

চিন্তিত অন্তরে সারাপথ অতিক্রম করিয়া বাটীতে আসিয়া হৃদয়টা স্বতঃই স্পন্দিত হইয়া উঠিল। শ্রীমতীর নিকট আত্ম-গরিমা বাড়াইয়া বাহাদুরী লইবার ইচ্ছাটা আমার ষোলআনা বজায় ছিল। আমি ভয়ানক একটা কৃতীত্বশালী ব্যক্তি, আমার বুদ্ধি-কৌশলের কাছে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে অনেকেরই মাথা ঘুরিয়া যায়, সর্ব্বদা তাহাকে এই কথাই বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতাম। সেই আমি, সেই প্রিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, গত রজনীর দুর্ঘটনার কথা তাহার নিকট আমি কোন্ মুখে ব্যক্ত করিব? সে দিন বেতনের টাকা লইয়া গৌরবান্বিত হৃদয়ে যখন তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিয়াছিলাম, সে শতজন্মের সাধনার সামগ্রী ভাবিয়া আমাকে আদরে বুকে আশ্রয় দিয়াছিল। সে দিনের সুকীর্ত্তির জন্য সে হাসির মালা গাঁথিয়া আমার চরণে উপহার

দিয়াছিল,—আর আমি প্রিয়জনের সেই স্নেহোপহার সযত্নে তুলিয়া লইয়া সাদরে গলায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। আজ এই মর্ম্মভেদী কাহিনী শ্রবণ করিয়া হতভাগ্য স্বামীর জন্য সে কি উপহারের ব্যবস্থা করিবে? যে নরাধম এতটা ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া জীবন-যাপন করে, নিরক্ষর পাহারওয়ালা যাহাকে তস্কর বলিয়া ঠাওরায়, আর সেই অসম্মানটা উপাদেয় আহার্য্যের মত বেমালুম হজম করিয়া,—অন্ধকার হাজতে গিয়া পঙ্গুর মত যে বসিয়া থাকে, তাহার যোগ্য পুরস্কার নারীর উপহাস বই আর কি?

সে দিন কৃতীত্বের বলে হাসির হার গলায় পরিয়া সুখের ঘোরে বিভোর হইয়াছিলাম,—আজ অকৃতীত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া হয় ত' বিদ্রূপের বাণে জর্জ্জরিত হইব। অবনতশিরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিচারপতি যেমন মুক্তিপ্রদান করে না, অগ্নিদগ্ধ দেহে জলধিতে ঝাঁপ দিলে জ্বালা যেমন নিভিয়া যায় না, অন্তররাজ্য তোলপাড় করিয়া একটা করুণ কান্নার সুর তুলিয়া প্রিয়াকে সহস্রবার বুঝাইলেও সে তেমনি বুঝিবে না, সে মুখ ফুটিয়া না বলিলেও তাহার প্রাণটা হয় ত' বলিবে—"আমি নিতান্ত অধম, পৃথিবীতে আমার কিছুমাত্র সম্মান নাই, নহিলে বর্ব্বর পাহারওয়ালার হাতে পড়িয়া সম্মান হারাইতে হয় কেন?"

সম্পূর্ণ ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আমি বাটীর আঙ্গিনায় গিয়া খাড়া হইলাম। সরমজড়িত চক্ষে বারান্দার দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—অমরেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিদ্রূপের হাসি ছুঁড়িয়া প্রথমেই আমার হৃদয়টাকে আক্রমণ করিয়া বসিল। এই অদ্ভুত আক্রমণের তীব্র বেদনা

অন্তরের নিগূঢ় প্রদেশে এমন একটা ব্যথার বেগ জাগাইয়া তুলিল, শত চেষ্টা করিয়াও আমি তাহার প্রভাবটাকে দমন করিয়া রাখিতে পারিলাম না। বুঝিতে পারিলাম না রমনী কোন্ গুণে দয়াবতী! যাহাদের কণিকা মাত্র করুণালাভের জন্য গত রজনী হইতে প্রাণ বিকলিত হইয়া উঠিয়াছে, প্রিয়ার কুঞ্জদ্বারে আসিতে না আসিতে এইখানেই তাহার চরম পরিদর্শন। পরে আরও কি না দেখিতে হইবে।

শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় শয্যা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। কিন্তু যে কারণে ভয়াকুল অন্তরে এতক্ষণ এত দুর্ভাবনাকে মনে স্থান দিয়াছি, যে কারণে দুঃখের নিবীড়-বনে পড়িয়া কণ্টকবিক্ষত দেহে এত তীব্র যাতনা সহিয়াছি, অকস্মাৎ স্তিমিত প্রদীপের নির্ব্বাণের মত সেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবটা হৃদয় ছাড়িয়া যেন কোন্ অজানা পথে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দারুণ পিপাসায় কাতর হইয়া—ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া ছুটিয়া যেটাকে মরিচীকার অপভ্রংশ বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল, দেখিলাম বাস্তবিক সে একটা পুণ্য-পূত-প্রবাহিনী নির্ম্মল খরস্রোতা। অশান্তির দুর্ভেদ্য প্রাচীর দ্বারা তাহার চারি-দিক্‌টা আবৃত নহে,—তাহা শান্তির স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণে পরিপ্লাবিত।

এই কবিত্বের মধ্যে আমার বাস্তব ঘটনার সকল কথাগুলিই সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। তথাপি উহা নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া বলার প্রয়োজন নহে কি? শ্রীমতির অবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, তাহার অধরের স্তিমিত দ্যুতি যেন অস্বাভাবিক অনুজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ

হইয়াছে, যেন বিচ্ছিন্ন বন-কুসুমের ন্যায় অনাদরে বিন্যস্ত,—**স্বভাবতঃই** বিমলীন।

আমি সরম বর্জ্জন করিয়া বিছানার উপর আসিয়া বসিলাম। সে বিহ্বল নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া—কি রকম একটা দম্‌কা নিশ্বাস ফেলিয়া—নীরবে কাঁদিয়া উঠিল। বুঝিতে পারিলাম না সংসারে কোন্‌টার দাম বেশী। সে দিন দেখিয়াছিলাম, রমণীর চারু অধরের হাসির নির্ম্মল প্রস্রবণ পুরুষকে শান্তিমগ্ন করিয়া তাহার নিভৃত হৃদয়-রাজ্যের আলয়ে দ্যুতির প্রভা প্রকটিত করে, আজ দেখিলাম—সে দিনের সেই অত্যুজ্জ্বল হাসির চেয়ে এই অশ্রুর দাম যেন আরো বেশী।

শ্রীমতির কান্না থামাইবার জন্য আমি ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। সে আমায় বাধা দিয়া বলিল—"আর আমাদের কল্‌কাতায় থেকে দরকার নাই—দেশে চল। যেখানে এত অত্যাচার, যেখানে সতীর বুক থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে দুর্ব্বৃত্তরা অকারণে বন্দী কোরে রাখে, সেখানে স্বামী-স্ত্রীর বাস করা উচিত নয়।"

আমি তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলাম—"প্রিয়ে, তুমি বুঝতে পার না। এখানে কে চোর, কে সাধু, তারা তা জানে না। তারা সন্দেহের বসে যতটা পারে কাজ সারে। আমাদের উচিত সাবধান হোয়ে পথ চলা।"

শ্রীমতি আমার কোনো কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—"কাল রাত্তিরে আমার এমন মনে হোয়েছিল, একজন সঙ্গী পাই ত' তোমার আপিসে গিয়ে দেখে আসিগে। তারপর রাত চারটের সময়

পুরুতঠাকুর এসে যখন খবর দিয়ে গেলেন,—তুমি ধরা পোড়েচ, আমার প্রাণ ফেটে যেতে লাগলো। মনে কল্লুম একখানা ময়লা কাপড় পোরে দুর্ব্বৃত্তদের গারদের সামনে গিয়ে বলিগে—“আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও, আমার আর কেউ নাই।”

শ্রীমতির খেদোক্তি শুনিয়া প্রাণের ভিতরটা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইবার উপক্রম হইল। আবেগ সংবরণ করিয়া তাহাকে বলিলাম—“তুমি দেখ্‌চি মস্ত একটা পাগল। তারা ধোরে নিয়ে গেল বোলেই কি আমরা ধরা প’ড়ে গেলুম ? এই ত’ আবার ফিরে এলুম। যাও, ওসব কথা আর ভেবো না।”

শ্রীমতি দ্বিরুক্তি না করিয়া রাত্রের খাবারগুলি বাহির করিয়া আমাকে আহারের জন্য উপরোধ করিয়া ধরিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—“কাল রাত থেকে তুমিও বোধ হয় শুকিয়ে আছ ?”

সে প্রত্যুত্তর করিল না।

আমি বলিলাম—“ভাল যা হোক্ মেয়ে মানুষের প্রাণ। পুরুষ বাড়ী থেকে বেরুলো ত’ আর তাদের রক্ষা নাই। আস্‌তে দেরী হোলে মনে কল্লে, পৃথিবীটা যেন উল্টে গেল, কতক্ষণে প্রাণনাথ এসে কাছে দাঁড়ায়। কিন্তু পুরুষগুলো কি তাই ভাবে মনে কর ? তারা পথে বেরুলে সব ভুলে যায়।”

শ্রীমতি বলিল—“তাদের হয় ত’ সে শক্তি আছে। আমরা যে নারীজাতি। তারা বাইরে যায়, বাইরে গিয়ে আমাদের কোনো নিদর্শনই তারা খুঁজে পায় না, আর আমরা ঘরের মাঝখানে থেকে তাদের হাজার হাজার চিহ্ন খুজে নিয়ে ভেবে আকুল হই। সকাল

বেলা যে গ্লাসটিতে জল খেয়ে বেরিয়েচে, যার গায়েতে আঙ্গুলের ছাপ্‌টা এখনো বজায় রোয়েচে, গ্লাসটা সাম্‌নে প'ড়ে—তার দেখাটি নাই। যে বিছানায় একটু আগে বিশ্রাম কোরে গেছে, যা থেকে পায়ের চিহ্নটা এখনো মুছে যায়নি, শয্যাটা শূন্য প'ড়ে রোয়েচে—তার দেখাটি নাই। নিজের হাতে পান সেজে দিয়েচি, পানটি চিবিয়ে ছিব্‌ড়েটি পর্য্যন্ত ফেলে রেখে গেছে—তার দেখাটি নাই। গায়ের জামাটা আল্‌নায় ঝুল্‌চে, ছেঁড়া জুতোজোড়া উল্টে পোড়ে রোয়েচে, ফটোখানা চোখের সাম্‌নে জ্বল্‌ জ্বল্‌ কচ্চে,—অথচ হাত বাড়িয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না। এতগুলো স্মৃতি যদি তোমাদের পেছনে পেছনে ফির্‌ত—তোমরাও এইরূপ ভেবে সারা হোতে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"ব্যাপার কি বল দেখি? আজকাল যে অনেক কথাই শিখে গিয়েচ। আজকালকার শিক্ষাগুরু তোমার কে?"

শ্রীমতি—"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রথমভাগ—আবার কে!"

আমি—"আমি ত' জান্‌তুম লেখাপড়া শিখ্‌লে মেয়েমানুষগুলোর মাথা খারাপ হোয়ে যায়।"

শ্রীমতি—"তা হোলে আমরাও তাই হোয়েচে মনে কর।"

আমি—"সম্ভব তাই। তোমার সইকে একবার জিজ্ঞাসা কোরে দেখো দিকিনি।"

শ্রীমতি বিষণ্ণ অধরে মাথাটা নীচু করিয়া কি ভাবিতে লাগিল। আমি বিস্মিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—

"অমন কোরে রইলে যে? সইয়ের সঙ্গে কি তোমার মনোমালিন্য হোয়েচে?"

শ্রীমতী মাথা নীচু করিয়া বলিল—"সই আমার সঙ্গে কথা বলেন না। ডাক্তারবাবু তোমায় ছাড়াতে গেলেন বোলে তিনি যেন কত অসন্তোষ।"

আমি উদ্বেগভরে বলিলাম—"বল কি? এ কথা শোন্‌বার আগে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হোলেও যে ভাল ছিল। এ আশ্রয় যদি আমাদের ত্যাগ কর্‌তে হয়, গিয়ে দাঁড়াব কোথায়?"

শ্রীমতি বলিল—"কেন, দেশের মানুষ না হয় দেশে ফিরে যাব। নারী হোয়ে নারীর অপমান সহ্য করার চেয়ে সেটা কি ভাল নয়? তিনি না হয় ধনবানের স্ত্রী, আমার স্বামী না হয় গরীব, কিন্তু স্ত্রী মর্য্যাদা আমারও আছে ত'?

আমি বলিলাম—"ঈশ্বরের অভিপ্রায় যদি তাই হয়, অমরেন্দ্র-বাবুর কথা না শুনে আমি কিছু কর্ব্ব না। পৃথিবী আমায় অকৃতজ্ঞ বোলে ঠাওরাবে।"

শ্রীমতি আহারের জন্য অত্যন্তই জেদাজিদী করিতে লাগিল। আগের রাত্র হইতে জলস্পর্শ করি নাই। বিনা আপত্তিতে আমি আহারে মনোনিবেশ করিলাম।

সুচারুরূপে আহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিলাম। শ্রীমতি পদসেবা করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"আগে প্রসাদগুলো উদরস্থ কোরে নাওগে, সেবা কর্‌তে হয় তার পরে কোরো।"

রমণীর এই নিঃস্বার্থ সেবার কথা ভাবিয়া মনে হয়, পুরুষকে এতটা স্বার্থপর করিয়া তুলিবার গোড়াই তাহারা। তাহারা দীর্ঘ রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিয়া পথের দিকে চাহিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে,—আর তাহারা সারারাত্র অসৎ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অথবা কোনো রং-তামাসা দেখিয়া, প্রভাতে আসিয়া হাসিয়া দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রাণটাকে দৃষ্টির বাঁধনে তাহারা এমনই শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলে যে, নারী নিজের আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, তাহাদেরই তৃপ্তি সাধনের জন্য হৃদয় পাতিয়া দেয়। নারীর সেই বিষণ্ণ কালিমামাখা মুখখানির দিকে চাহিয়া পুরুষ একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, তাহার অবর্ত্তমানে সুদীর্ঘ রজনী সে কি দুঃসহ যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিয়াছে।

আমার সেবা-উপভোগের অপেক্ষা শ্রীমতির আহারের জন্যই আমি বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম। জগৎ যদি আমায় স্ত্রৈণ ভাবে ভাবুক্, সমাজ যদি আমায় ঘৃণা করে করুক্।

১১

একাধিক্রমে তিন বৎসর অতীত হইল না অমরেন্দ্রনাথের স্ত্রীর সহিত শ্রীমতির মনোমালিন্য ভাবটা যেন ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিল। এই মর্ম্মঘাতী মনোমালিন্যের কারণটা অপরের পক্ষে অতি পরিহার্য্যকর হইলেও—আমার পক্ষে বড় সামান্য সন্তাপের কথা নহে। দুর্দ্দিনের আশ্রয়দাতা কোনো কারণে যদি দুঃখিত হন অথবা আশ্রিতজনকে পরিত্যাগ করিতে চাহেন, ভগবানের আসন নিশ্চয়ই কাঁপিয়া উঠিবে, সে দুর্ব্বৃত্তকে কেহই স্নেহের চক্ষে দেখিবে না।

এইরূপ শত সহস্র দুর্ভাবনা লইয়া দিনাতিপাত করা কি সহজ? সারাদিন পরিশ্রমের পর বাড়ীতে আসিয়া সর্ব্বদাই যেন বিষণ্ণ ভাব। শ্রীমতি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে যা-তা একটা কথা বলিয়া বুঝাইয়া দি। আমার এই মর্ম্মদাহ জ্বালার কণিকা মাত্রও যদি তাহাকে স্পর্শ করিত, সে বুঝিত কত জ্বালায় এ হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইতেছে,—এই হিয়ার মধ্যে পৃথিবীর কতটা অশান্তি বিরাজমান।

এই ভাবে দিন কাটিতেছিল। একদিন সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় আসিয়া শুনিলাম হায়দ্রাবাদ হইতে অমরেন্দ্রবাবুর টেলিগ্রাম আসিয়াছে। তিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া এক বৎসরের জন্য যাত্রা করিবেন।

আমাকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া তিনি বলিলেন—"কালই আমায় হায়দ্রাবাদ যেতে হচ্ছে। তুমি এখন কি কর্‌তে চাও?"

আমার মুখ হইতে বাক্যস্ফুরিত হইল না। এ ক্ষেত্রে আমার কি করা দরকার? এই অশান্তির বোঝা মাথায় লইয়া কাহার আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইব? দুঃখবেগ সংবরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—"আপনি যা আদেশ কর্ব্বেন আমি তাই কর্‌তে সম্মত। বুঝ্‌তে পাল্লুম আমার অদৃষ্ট মন্দ।"

অমরেন্দ্রবাবু—"দেখ, আমার ইচ্ছা নয় যে আমি তোমাদের ছেড়ে থাকি। কি করি চাক্‌রী বড় বালাই, সে স্নেহ মমতা আত্মীয়তা কারো তোয়াক্কা রাখে না। তুমি এক কাজ করগে, নরেশবাবুকে আমি বোলে দিয়েছি—উপস্থিত তাদেরই বাড়ীতে থাকগে। একখানা ঘর হোলেই তোমাদের চল্‌বে, মাসে আটটা টাকার বেশী ভাড়া দিতে হবে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি আমাদের আশ্রয় দিতে রাজী কি না?

অমরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাদের নারাজ হবার ত' কোনো কারণ নাই। তারা পাঁচজনকে ভাড়া দেয়—তোমাকেও ভাড়া দেবে, তাদের পেশাই ভাড়া উঠানো।"

আমি—"এ বাড়ীটা কি কর্ব্বেন?"

অমরেন্দ্রবাবু—"বাড়ীওয়ালারাই এসে বাস কর্ব্বেন। আমি আপত্তি কল্লে আরো কিছু দিন রাখ্‌তে পাত্তেম বটে, কিন্তু রেখে লাভ কি? মিছি মিছি পঞ্চাশটা কোরে টাকা দেওয়া।

তবে তুমি যদি ভারটা কাঁধে নিতে পার আমি আট্‌কে রাখ্‌তে পারি।”

আমি হাসিয়া বলিলাম—“হাঁ, পঞ্চাশ টাকা যার মাইনে—সেই পঞ্চাশ টাকা ভাড়া দেবে বটে।”

অমরেন্দ্রবাবু—“সেই জন্যই নরেশদের বাড়ী ঠিক্ কোরে দিলুম। দু’পয়সা যখন রোজগার করতে শিখেচ, সঙ্গে সঙ্গে নিজের পায়ে ভর কোরে দাঁড়াতে শেখ। আর একটা কথা বলি,—কখনো অন্যায় পথে চোলো না, যতটা পার তাকে বর্জ্জন কর্‌তে চেষ্টা কর্বে। প্রথম জীবনটা যদি সিধা হোয়ে চল্‌তে পারা যায়, পরকালের জন্য আর ভাবতে হয় না, সর্ব্বদা এই কথাটা স্মরণ রেখো।”

আমি আবেগ উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলাম—“আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য, যতদিন জীবিত থাক্‌বো সাধ্যমত আপনার কথামতই চল্‌তে চেষ্টা কর্ব্ব। একটি মাত্র আমার আকিঞ্চন,—হতভাগ্যের কথাটা আপনি স্মরণ রাখ্‌বেন।”

অমরেন্দ্রবাবু বলিলেন—“হায়দ্রাবাদে যে আমাদের বরাবরই থাক্‌তে হবে তার কোনো মানে নাই। হয় ত’ এক মাসের মধ্যেই আবার ফিরে আস্‌তে পারি। যখনি আমরা আসিনা কেন, আর তোমরা যে কোনো স্থানে থাক না কেন, কল্‌কাতায় এসে আগেই তোমাদের খপর নেবো।”

আমি ক্লিষ্টমুখে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি চামড়ার ব্যাগ হইতে এক ছড়া সোণার হার বাহির করিয়া

আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"শ্রীমতিকে একটা উপহার দেবার জন্য আমি অনেকদিন থেকে আশা কোরেছিলুম। এই হার ছড়া তার গলায় পরিয়ে দিয়ো।"

আমি হার গাছটি গ্রহণ করিয়া বিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি বলিলেন—"মনে ভোবোনা যেন, আমরা বড়লোক আর তোমরা গরিব বোলে তোমাদের কাছে বড়ত্ব জাহির কোরে যাচ্চি। এর একটা নাম সোণার হার বটে, কিন্তু এর চেয়েও যদি একটা বড় নাম থাকে,—তার নাম স্নেহের উপহার।"

আমি প্রস্থান করিলাম।

১২

দেখিতে দেখিতে চার মাস কাটিয়া গেল অমরেন্দ্রনাথ হায়দ্রাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। আমরা এখন নরেশবাবুর ভাড়াটিয়া বাটীর একখানি ক্ষুদ্র গৃহ ভাড়া লইয়া বাস করিতেছি। অমরেন্দ্র-বাবু নরেশচন্দ্রকে উপরোধ করিয়া ধরায় তিনি যে ঘরখানির ভাড়া আট টাকায় রফা করিয়া দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ঘরের ভাড়া আমাদের দশটাকা করিয়া দিতে হইতেছে। নরেশবাবু আমার আশ্রয়দাতা অমরেন্দ্রনাথের বন্ধু, সুতরাং তাঁহার নিকট আমার দ্বিরুক্তি করিবার কিছু নাই। বিশেষতঃ তিনি আমাদের দারিদ্রতা স্বচক্ষে দেখিয়াও বর্দ্ধিত ভাড়ার জন্য যখন অম্লানবদনে তাগাদা করেন, আমার স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়া তাঁহার ভাড়া চুক্তি করিয়া দিলেও যখন তাঁহার আপত্তি নাই,—এই রকম একটা ভাব দেখান, আমার কর্ত্তব্য বিনা ওজরে তাঁহার বাক্য পালন করা।

মাস কাবারের পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট ভাড়ার টাকা আমি চুক্তি করিয়া দি। এ জন্য বাটীর অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা আমার উপর বড় সন্তুষ্ট নহে। তাহারা আমাকে একতা-ডোরে আবদ্ধ করিবার জন্য কত উত্তেজিত করিয়া তুলে, আমি কোনো কথাই কাণে তুলি না। বরং গর্ব্বের সহিত তাহাদিগকে বলি—"আমার সঙ্গে বাড়ী-ওয়ালার অন্য সম্বন্ধ আছে, ভাড়া কমাবার জন্য প্রতিবাদ করা আমার সাজে না।"

কিন্তু ধনবান নরেশচন্দ্র তাহা বুঝেন কি? ইচ্ছা করিলে কি তিনি দু' টাকা ভাড়া কমাইয়া আমার সাহায্য করিতে পারেন না? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন যে, তাঁহার প্রিয়বন্ধু কত অনুরোধ করিয়া তাঁহার হাতে আমায় সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন? তিনি হাজার হাজার টাকা বাজে কাজে ব্যয় করিয়া, আমার কষ্টোপার্জ্জিত দুইটা টাকার জন্যই যদি ব্যস্ত হন, তাঁহার উচ্চতা তিনি যদি স্বেচ্ছায় পদদলিত করেন, আমি তাঁহাকে অসম্মান করিব কেন? আমার বুকের মাংস টুক্‌রা বিক্রয় করিয়াও তাঁহার সম্মান আমি রক্ষা করিব।

মিউনিসিপালিটির তিন টাকা কি চারি টাকা ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্রত্যেকের গড়ে দুই টাকা হিসাবে ভাড়া বাড়িয়া গেল। প্রতিবাদ করিবার জন্য সকলেই বদ্ধ পরিকর হইল, কেবল যে ব্যক্তি সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া চক্ষু-লজ্জাটাকে এখনো কোনো প্রকারে বজায় রাখিয়া চলে অথবা যে আমারই ন্যায় কৃতজ্ঞতা রক্ষার জন্য নিয়োজিত—সে কোনো দ্বিরুক্তি করিল না। কয়েক-দিন গোলমাল করিয়া কাটাইয়া ক্লিষ্ট-মুখে আবার যে যাহার কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

বাড়ীখানার মধ্যে সর্ব্বদাই যেন একটা হা হা রব পরিপূর্ণ। মলিন বসনাবৃতা নিরাভরণা বাঙ্গালীর মেয়েরা এত কষ্ট সহিয়াও যে স্বামীর ঘর করে, কোনো বিদেশীয় বা এ দেশীয় ধনীর সন্তান স্বচক্ষে না দেখিলে হয় ত' প্রত্যয় করিবেন না। তৈলাভাবে কোনো মহিলার মাথায় জটা পড়া, রন্ধনাদির জন্য কারো গায়ে হাতে পোড়া দাগ, জল-কার্য্যের জন্য কারো পায়ের আঙ্গুলে হাযা'র ক্ষত, আঠারো

বৎসর উত্তীর্ণ হইবার আগেই কেহ বার্দ্ধক্যে অবনত, কেহ লোলচর্ম্মা, কেহ বা রুগ্নশয্যায় শায়িতা। পুরুষরা বাহিরে চলিয়া যায়, সারাদিনের পরিশ্রমের পর হাড়ভাঙ্গা ব্যথা লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে ফিরিয়া আসে, এই সময়ে কত তাগাদাদার আসিয়া তাহাদের রমণীদের যে কত লাঞ্ছনা করিয়া যায়, কত তিরস্কার যে তাহারা নীরবে সহ্য করে—ধনীর নন্দিনীরা তাহা বুঝিবে কি? ধনীর প্রাসাদ-শিখরের মহিলা-নৃত্য দেখিয়া যাহারা বঙ্গ-মহিলার মর্য্যাদার মাথায় আঘাত করিতে চান,—তাঁহারা ভিখারীর পর্ণকুটীরে আসিয়া প্রত্যক্ষ করুন, বঙ্গনারীর মহত্ত্ব এই খানেই জ্বলন্তাক্ষরে প্রতীয়মান হইবে।

আমার পঞ্চাশ টাকা মাহিয়ানায় সংসারটা যেন আর চলে না। সাংসারিক কাজ-কর্ম্ম শ্রীমতি এখন নিজেই সারিয়া লয়। কিন্তু অপরাহ্নের সাজ-সজ্জাটা ভাল না হইলে তাহার মন উঠে না। মাসে তিন শিশি সুগন্ধি তৈল, একটা হেজ্‌লিন, একবাক্স সাবান এটা তাহার দৈনন্দিন খরচের মধ্যে। ঘরের ভাড়া, পকেট খরচ, পাড়ার দুর্দ্দান্ত যুবকদের বারোয়ারীর চাঁদা, বন্ধুবান্ধবের বিশেষ অনুরোধে একরাত্রের জন্য সাহানা রজনীর থিয়েটার দেখা, ইত্যাদি ব্যাপারে পঞ্চাশটি টাকা যেন পাঁচ দিনে উবে যেতে চায়।

এ দিকে বাটীর অপরাপর মহিলাদের অপেক্ষা শ্রীমতির অঙ্গসজ্জার আসবাব বেশী। গরিব মহিলারা ভাগ্যবানের স্ত্রী মনে করিয়া তাহাকেই সর্ব্বাগ্রে আসন পাতিয়া দেয়। এই অযাচিত সম্মানটুকু রক্ষার জন্য যা কিছু মাল-মসলার প্রয়োজন হয় আমাকেই যে যোগাড় করিয়া আনিতে হয় তাহার আর অন্যথা কি?

কষ্টের প্রভাবটা দিন দিন বাড়িয়া গিয়া জীবনটাকে যেন প্রবল প্রপীড়িত করিয়া তুলিল। সংসারের ঘোর চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া, যাতনা ভুলিবার জন্য যখনি ভগবান্‌কে ডাকিতে যাই, বিশ্ব-স্বামীর চরণে বেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য যখনি নির্জ্জনে গিয়া দাঁড়াই—পার্শ্ব হইতে অমনি শ্রীমতির করুণ আহ্বান একশিশি এসেন্স আনিবার জন্য আমায় সতর্ক করিয়া দেয়। সংসারে যে সুখ আয়ত্ব করিতে গেলে পাঁচদিনে পঞ্চাশ টাকার প্রয়োজন,—সেই সুখ আয়ত্ব করিতে হইবে অথচ পাঁচদিনের খরচ আমার এক মাসের আয়। অভাব আমার স্কন্ধদেশে যেন অবাধে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিল।

আজকাল শ্রীমতিরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে সে যে পরিমাণ অশিক্ষিতা ছিল,—বর্ত্তমানে তাহার চতুর্গুণ পরিমাণ শিক্ষালাভ করিয়াছে। আজকাল দ্বিপ্রহর-বেলার আরাম উপভোগের জন্য দু'একখানা ভাল বই, দু'একখানা মাসিক পত্রিকাও কিনিয়া আনিতে হয়।

সারাদিন পরিশ্রমের পর চিন্তাক্লিষ্ট-মুখে বাটীতে আসিয়া দেখিলাম,—মনোহর ভূষায় সজ্জিতা হইয়া শ্রীমতি মহিলা-মজলিসের মাঝখানে উপন্যাস পাঠ করিতেছে। সম্মুখের বারান্দার রোয়াকে বসিয়া যুবক পরাণচন্দ্র দুরভিসন্ধির দৃষ্টিতে তাহার দিকে ঘন ঘন চাহিতেছে। তাহার চক্ষুদ্বয় ঘোর আরক্তিম, সে যেন সুরার নেশায় ভরপুর। আমাকে দেখিয়াই সে টলিতে টলিতে বাটীর বাহির হইয়া গেল। আমি আর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে

পারিলাম না। ব্রহ্মাণ্ডের বুকের উপর দিয়া ভূমিকম্পের যেন একটা স্পন্দন ছুটিয়া গেল। শশব্যস্তে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রীমতিকে চীৎকার করিয়া ডাকিলাম।

পূর্ব্বের সেই সরল হাসির সুস্পষ্ট আভাসটুকু লইয়া—সে আজও আমার সম্মুখে আসিয়া হাসিয়া দাঁড়াইল। আমার মাথাটা যেন তখনো সিসার মত ভারি। আমি স্থির অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। সে আমার মর্ম্ম-বেদনা নিশ্চয়ই অনুভব করিতে পারিয়াছিল। স্কন্ধ হইতে ছেঁড়া উড়ানীখানা আল্‌নায় গুছাইয়া রাখিয়া, গলার বোতাম খুলিয়া দিয়া হাওয়া করিতে করিতে সে বলিল—"আজ বড় কষ্ট হোয়েচে দেখ্‌চি। ঘরে পা দিতে না দিতে ঘেমে নেয়ে অস্থির।"

আমি ব্যথিত-কণ্ঠে বলিলাম—"তুমি সুখী হোয়েচ যে এই যথেষ্ট।"

শ্রীমতি—"আমাকে সুখী কর্ব্বার জন্যই ত' তুমি কল্‌কাতায় এসেছিলে। আজ তার জন্য অনুতাপ কচ্চ কেন?"

আমি—"জান্‌তুম না যে রমণী এমন সাপিনীর জাত। নইলে আমার পদচিহ্ন বুকে রাখবার জন্য যে একদিন স্বেচ্ছায় হৃদয় পেতে দিত, সেই আজ আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে দংশাবার জন্য উদ্যত।"

শ্রীমতি বলিল—"এটা কি নতুন কিছু গা? তোমাদের পুরুষ-দের মধ্যে এটা কি দেখা যায় না? সে দিন শুন্‌লুম, একজন ধার্ম্মিকলোক ছিলেন, উদারতার জন্য পাড়াপড়শী তাঁকে ইষ্টদেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা কর্‌ত, কিছুদিন যেতে না যেতে দেখা গেল, তিনিই আবার

উলঙ্গ হোয়ে বাঁশের ডগ্‌লা হাতে নিয়ে ছুটো-ছুটি কচ্চেন। বল দেখি এটা তাঁর কতদূর অন্যায় ?"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই তিনি তখন বিবেকশূন্য হোয়েছিলেন অথবা উন্মাদনা তাঁকে আশ্রয় কোরেছিল।"

শ্রীমতি—"সেইরূপ উন্মাদনা কি রমণীকে আশ্রয় কর্‌তে পারে না গা ?"

আমি—"তা যদি হোত, আমি তোমার জন্য সোণার পিঞ্জর নির্ম্মাণ কোরে রাখতুম। কিন্তু এই কি তোমার কর্ত্তব্য ? এই কি তোমার রমণীয় মর্য্যাদা ? ধর্ম্মের কাছে তুমি কি জবাব দাখিল কর্ব্বে ? তোমার যে নরকেও স্থান হবে না।"

শ্রীমতি—"তা না হোক্, পরাণচন্দ্র আমায় বঞ্চিত কর্ব্বে না। তুমি যাও, আইনমতে আমি তোমায় পরিত্যাগ কর্‌তে পারি।"

আমি বুঝিতে পারিলাম না আমি প্রকৃতিস্থ কি না। এই কথা যদি সত্য হয়, প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পিশাচিনীর ন্যায় অট্টহাস করিয়া আমাকে যদি এই ভাবেই পদদলিত করে, আমার কর্ত্তব্য কি ?

শ্রীমতিকে নির্দ্দেশ করিয়া আমি বলিলাম—"প্রিয়তমে আমার উপযুক্ত শিক্ষালাভ হোয়েচে। আজ থেকে তুমি আনন্দে স্বেচ্ছাচার কর্‌তে পার। আমি তোমার প্রতিবন্ধক হব না।"

উর্দ্ধশ্বাসে ঘরের বাহির হইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলাম। শ্রীমতি দ্বারপথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এখন কি কর্‌তে চাও ?"

আমি উত্তেজিত-স্বরে বলিলাম—"আত্মহত্যা।"

শ্রীমতি বলিল—"শাস্ত্রমতে তোমার দেহের ওপর আমারও অর্দ্ধেকটা অধিকার আছে। তুমি নিজস্ব ভেবে এটাকে স্বেচ্ছামত নষ্ট করতে পার না।"

প্রাণ দারুণ যাতনায় অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া ব্যথিত-কণ্ঠে আমি তাহাকে বলিলাম—"একদিন জ্যোৎস্না ধোওয়া ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে এইরকম একটা গল্প তোমায় বোলেছিলুম, তার প্রত্যুত্তরে তুমি কি বোলেছিলে মনে পড়ে কি?"

শ্রীমতি বলিল—"মনে পড়ে বৈকি! আমি তাকে আজও ঘৃণা করি।"

আমি বলিলাম—"এ প্রবৃত্তি তবে ঘটালে কেন?"

শ্রীমতি তাহার অঞ্চল হইতে একখানি সোণার লকেট বাহির করিয়া, আমাকে দেখাইয়া বলিল—"দেখ, পরাণবাবুর অধীনতা-নিগড়ে আমি বাঁধা পড়ি আর না পড়ি তার ছবিখানা আমার গলায় মরণকাল পর্য্যন্ত টাঙ্গান থাক্‌বে। এই দেখ, তার কঠোর লকেট তৈরী কোরে আজ আমায় সে স্বহস্তে উপহার দিয়ে গিয়েচে।"

আমি শশব্যস্তে সেই লকেটখানি হাতে করিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইয়া পড়িলাম। একবার দুইবার উপর্য্যুপরি তিন তিন বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম, এ যে আমারই প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত! বিস্ময়ে বাক্যস্ফুরিত হইল না।

শ্রীমতি আমার পদতলে বসিয়া পড়িয়া অশ্রুপূরিত-কণ্ঠে বলিল—"ছিঃ—এত দুর্ব্বল হৃদয় তোমার! একটা ভুল ধারণা নিয়ে সহধর্ম্মিণীকে সন্দেহের চক্ষে দেখা কতদূর অন্যায় বল

দেখি? কোথায় আকাশের শশাঙ্ক—আর কোথায় মর্ত্তের এই পরাণচন্দ্র।"

আমি আবেগস্ফুরিত-কণ্ঠে বলিলাম—"তবে কি আমার ধারণা ভুল? আমার কি দৃষ্টিভ্রম হোয়েছিল?"

শ্রীমতি বলিল—"ধারণা নিশ্চয়ই ভুল। তবে দৃষ্টিভ্রম না হোতে পারে। পরাণচন্দ্র যে আমার দিকে এইরকমই একটা চাওনি দিয়ে চেয়েছিল, তা আমিও জান্তুম।"

আমি বলিলাম—"যদি জান্তে আমায় এতদিন জানাওনি কেন?"

শ্রীমতি—"দরকার কি আর লাঠি-সোটা ধোরে! তুমি ত' বুদ্ধিমানের মত কথাটা হজম কর্‌তে পার্‌তে না, রাগের বশে যা-তা একটা কোরে বোস্‌তে।"

আমি—"পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া যে অনুচিত কাজ।"

শ্রীমতি—"পাপটা প্রশ্রয় পাচ্চে কোথায়? চোরের পিছনে পিছনে না ছুটে নিজের জিনিষটা যদি সাবধান কোরে রাখা যায়, চোর কৃতকার্য্য হোতে পারে কি? কথাটা যখন প্রকাশ হোয়ে পোড়লো—ভেঙ্গে বলি শোনো, এই দেখেই তুমি এত ক্রোধান্ধ হোয়ে উঠচ, আমি এর চেয়েও এমন একটা গুরুতর অন্যায় কোরেচি—যা শুনে তুমি আমায় একান্তই অবিশ্বাস কর্ব্বে। কিন্তু আমায় অপরাধিনী মনে কোরো না।"

আমি—"তোমার প্রতি আর আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস নাই। মনের কথা তুমি নিঃশঙ্কোচে ব্যক্ত কর।"

শ্রীমতি বলিল—"তোমার ওই বইখানার মধ্যে একখানা পত্র আছে পোড়ে দেখ।"

আমি পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে লেখা আছে—

প্রিয়ে!—

আমি তোমার জন্য উন্মাদ। যে দিন তোমার হাসিমাখা মুখ আমার হৃদয়দর্পণে এসে প্রথম প্রতিফলিত হোয়েছিল, আমি সেই দিনই পথভ্রষ্ট হোয়েচি। তোমার জন্য এইমাত্র ঘরভাড়া ঠিক করা হোলো। সম্প্রতি একখানা চৌকি, মাদুর বালিস মাটির কল্‌সি ঐ পানের ডাবর ওয়াললাম্প প্রভৃতি খরিদ করা হোয়েচে। তুমি আসিবা মাত্রই খাটের বায়না দেওয়া হবে। বিশ্বাসের জন্য তোমার কথামত অগ্রিম দশটাকা পাঠালাম। যত শীগ্‌গির পার সোরে এসো, বিরহজ্বালা আমার আর সয় না। ইতি

তোমার প্রাণাধিক—

শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস।

পত্রখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া রাগে মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল। তাহাকে প্রকাণ্ড একটা পাষণ্ড বা নরপিশাচ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে জগৎ হয় ত' বলিবে,—আমি গাত্রদাহ বশতঃ তাহাকে যা-তা বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে জগৎ হইতে সে কি আখ্যা পাইবার যোগ্য জগৎবাসী কেহ বলিয়া দিবেন কি?

ভদ্র-মহিলার প্রতি এই কঠোর দুর্ব্যবহার করা, এইরূপ অন্যায় পত্র দিয়া তাহার চরিত্রকে দূষিত করিয়া তোলা কতদূর অস্বাভাবিক ? ঘৃণায় ব্যথায় মর্ম্মস্থলটা মুচড়াইয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। আমি শ্রীমতির দিকে বিস্মিত-নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রিয়ে, তুমি সত্য কথা বল—অন্যায় কার! যদি তোমার অপরাধ হোয়ে থাকে আমি তোমায় মার্জ্জনা কচ্চি।"

শ্রীমতি উন্নত বদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"বুঝ্তে পাল্লে না অন্যায় কার ? আচ্ছা মোটা বুদ্ধি ত' তোমার।"

আমি বলিলাম—'নাঃ—আমায় তুমি ভেঙ্গে-চুরে বল, এ পত্র তোমায় কে দিলে ?"

শ্রীমতি—"স্বয়ং পরাণচন্দ্র স্বহস্তে।"

আমি—"সে সময় দুর্ব্বৃত্তের বুকে একটা পদাঘাত কর্তে পাল্লে না ?"

শ্রীমতি—"জনান্তিকে তা কল্লুম বৈকি। একজন ভদ্রলোক কত আক্ষেপ কোরে পত্রখানা লিখেচে, আবেগে কত কবিত্ব জাহির কোরেচে, সাধামত মাটির কল্‌সিটি পর্য্যন্ত কিনেচে, সাম্‌না-সাম্‌নি তাকে এতটা নিরাশ করা উচিত কি ?"

আমি—"তোমার নিরস রহস্য আর আমার ভাল লাগচে না। এটা কি রহস্যের কথা মনে কচ্চ ?"

শ্রীমতি—"না, ভেবে কেঁদে খুনোখুনি হবার কথা মনে কচ্চি। আচ্ছা পাগলামি সুরু কল্লে ত'। সে লোকটা যদি প্রবৃত্তির

দোষে খারাপ কথা বলে, আমায় কাণ দিয়ে কি তাই শুন্‌তে হবে গা ?"

আমি—"তা যা হোক্, কিন্তু চোরকে নিজের অধিকারে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় কি ? এ তুমি আমায় কি বোঝাচ্চ ?"

শ্রীমতি—"চোর চুরি কর্‌তে পাল্লে ত' ? সে কথা আমি তোমায় যে আগেই বল্লুম। দেখ, আমাতে আর তাতে অনেকটা তফাৎ। সে চণ্ডাল, পিশাচ, সংসারের জীবন্ত একটা পাপ,—আর আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, সতীত্ব আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তার সামর্থ্য কি সে আমার ছায়া স্পর্শ করে।"

আমি আবেগের ভরে বলিলাম—"ভেবে দেখ দেখি সেই দুর্ব্বৃত্তের কি কঠোর প্রাণ ! বৃদ্ধ মা, উপযুক্তা স্ত্রী বস্ত্রাভাবে উলঙ্গিনী-প্রায়, অন্নাভাবে উপোস কোরে দিন কাটায়, ভাড়ার জন্য দরোয়ানের লাঠির ঘা মাথা পেতে নেয়, আর চণ্ডাল উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা বেশ্যার পদসেবা কচ্চে, শুঁড়ির পাদদক খাচ্চে, বাবুয়ানা কোরে লম্বা কোঁচা ধোরে ঘুরে বেড়াচ্চে। নরাধমের এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?"

শ্রীমতি বলিল—"আমি সেই জন্যই তার ওপর এতটা মুগ্ধ হোয়েচি।"

আমি উত্তেজনার সহিত না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না যে—"না না, তুমি সাক্ষাৎ সতী, এত অধম অন্তঃকরণ তোমার নয়।"

শ্রীমতি কথঞ্চিত স্বর নম্র করিয়া বলিল—"দেখ, আমি যে দিন

বুঝলুম, আমার রূপের মোহে সে মুগ্ধ, আমাকে পাবার জন্য সে ব্যাকুল, এদিকে তার দুঃখিনী মায়ের শুক্‌নো মুখ, তার যুবতী স্ত্রীর ছেঁড়া বস্ত্র দেখে আমার চোখ অশ্রু চেপে রাখতে পারে না, বিরহে প্রাণটা তার দিকেই ঢোলে পোড়ল। সে এক পা এগিয়ে এসেছিল, আমি পাঁচ পা এগিয়ে গিয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পোড়ে তাকে বল্লুম—"প্রাণনাথ, আমি তোমারই। ধন, জন, জীবন, যৌবন বল্‌তে যা কিছু সব তোমারই। তুমি এক সন্ধ্যে আহার যোগাও ত' সেই আমার এক মাসের আহার, তুমি গাছ তলায় বসিয়ে রাখতো সেই আমার অট্টালিকা, বুঝলে কি না?"

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"ওসব পাপ প্রস্তাবে আর আমি কাণ দিতে চাই না। নরেশবাবুর সঙ্গে কথা কোয়ে আজই এর বিহিত কর্ব্ব।"

শ্রীমতি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—"কি আপদ, আমার অনুরাগটাই আগে শেষ কর্‌তে দাও।"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"না না, ওসব তোমার বাজে কথা! পথ ছেড়ে দাও আমি এখনি নরেশবাবুর কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলিগে।"

শ্রীমতি বলিল—আগে কথাটা সম্পূর্ণ কোরে শুনে নাও। আমি ত' তার পায়ের তলায় প্রাণটা কুমড়োর মত গড়িয়ে ফেলে দিলুম। বল্‌ব কি সে এমন ভাবে আমায় আলিঙ্গন কর্‌তে এলো, তুমি আমার সাতপাকের স্বামি তেমন আলিঙ্গন তুমিও কখনো কর্‌তে পারনি। আমি অমনি দশ-পা পিছিয়ে গিয়ে তাকে বল্লুম,—

"দেখ প্রাণেশ, সব কথাই ঠিক্ হোলো, কিন্তু আমি বিশ্বাস কর্‌বো কি কোরে যে তুমি আমায় ভালবাস।" সে তাড়াতাড়ি তার বুকটা যেন চাপ্‌ড়ে ভেঙ্গে ফেল্‌তে লাগ্‌লো। আমি বাধা দিয়ে বল্লুম—"না না, ও মর্ম্মঘাতী দৃশ্য আমি দেখ্‌ব না। তুমি কাল দশটার মধ্যে যদি দশটা টাকা আমায় দিতে পার—আমি বুঝ্‌ব—আমি যেমন তোমা ছাড়া নই,—তুমিও তেম্‌নি আমায় আপনার ভাব।"

আমি ব্যথাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিলাম—"এটা কি তোমার ভাল আচরণ হোয়েচে?"

শ্রীমতি বলিল—"ভাল মন্দ আমি তোমায় বিচার করতে বল্‌চি না, কথাগুলি সব কাণ দিয়ে শুনে যাও। তুমি আপিসে যাবার পরেই কপাটের আড়াল থেকে সে এই খামখানা আমার হাতে দিয়ে গেল। খুলে যা দেখলুম—এখন তুমিও তাই দেখ্‌চ, শুধু নোটখানা দেখ্‌তে পেলে না। প্রাণনাথের সেই নোটখানা ভাঙ্গিয়ে দশ সের চাল, আধমণ কাট, একখানা খদ্দরের কাপড়, কিছু বাজার আর অবশিষ্ট টাকা, তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলুম। সে এখনো বোধ হয় জান্‌তে পারেনি যে তার এত সাধের উপহার আমি এই ভাবে বিলিয়ে দিয়েচি। তুমি যদি আর একটু দেরী কোরে আস্‌তে—আমি তাকে আদর কোরে কাছে ডেকে বল্‌তুম—"বাছা আমার, তোমার শূন্য ভাণ্ডার দশদিনের জন্যও পূর্ণ হোয়েচে, তোমার ছিন্নবসনা সহধর্ম্মিণী নূতন বস্ত্র পরিধান কোরেচে, তোমার জীবনদায়িনী

জননীর ক্লিষ্ট মুখে হাসি ফুটে উঠেচে, তাদের পাশে গিয়ে বোসে তুমি ধন্য হও।'

আমি নির্ব্বাক হইয়া তাহার কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম। লকেটখানির কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সংসারের খরচ হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া এখানি সে নিজেই নির্ম্মাণ করাইয়াছে। আমি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

১৩

অফিস হইতে ফিরিতে আজ একটু দেরি হইয়াছিল। বাটীতে আসিয়া শুনিলাম শ্রীমতি বাটীর মহিলাগণের সহিত কালীমন্দিরে মায়ের আরতি দেখিতে গিয়াছে। আমি তাহার আগমন প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া রহিলাম। আটটার পর তাহার সঙ্গিনীগণ সকলেই ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহাকে আসিতে দেখিলাম না। পরাণচন্দ্রের মা আমার ঘরের ভিতর আসিয়া শোকপূর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"বাবা! তোমার সোণার কমলকে আজ পথে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম।"

আমি বজ্রাহতের ন্যায় শয্যা হইতে লম্ফ দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কোথায়?"

পরাণের মা কিছুক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়া—কিছু না বলিয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

ঘর হইতে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া রমণী-গণকে নির্দ্দেশ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা শীগ্‌গির কোরে বল আমার স্ত্রী কোথায়?" পরাণচন্দ্রের ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম সেও ঘরে নাই। মন আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সম্মুখস্থ গৃহের একটি রমণীকে ডাকিয়া বলিলাম—"তুমি সত্যি কোরে বল আমার স্ত্রী কোথায়। যদি না বল আমি এখনি পুলিশে খপর দিব।" তাহার স্বামী ঘরের ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া

আসিয়া বলিল —“মহাশয়, এতটা অধীর হবেন না, আপনার স্ত্রী মোটার চাপা পোড়েচে, তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হোয়েচে।”

হৃদয়ের ভিতর হইতে প্রাণটা যেন টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহির হইতে উদ্যত হইল। আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম—“সে কি মহাশয়, এমন সর্ব্বনাশ কে কল্লে! সে আমার বেঁচে আছে ত’?”

তিনি বলিলেন—“আশঙ্কা কর্ব্বেন না মহাশয়, তার জীবনহানি হবার কোনো সম্ভাবনা নাই। দক্ষিণ পায়ের হাড়খানা বোধ হয় একটু সোরে গিয়েচে।”

ঘর দ্বার সজ্জা সম্পদ কিছুর দিকেই আর চাহিতে ইচ্ছা হইল না। ভদ্রলোকটির ত্বটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম—“মহাশয়, আমার সর্ব্বনাশ হোয়ে গেল। এই নিন্ আমার ঘরের চাবিটা আপনি রাখুন। যদি আমার স্ত্রীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে পারি ভালই, নইলে কল্‌কাতা থেকে আমারও এই শেষ বিদায়।”

বাটী হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে মেডিকেল কলেজে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানকার একজন ষ্টুডেন্টকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে তিনি বলিলেন—“রোগীর সঙ্গে দেখা কর্ব্বার সময় উত্তীর্ণ হোয়ে গিয়েচে, কাল না হোলে আর দেখা হবার উপায় নাই।”

আমি তাঁহাকে জিদ করিয়া ধরিয়া বলিলাম—“মহাশয়, আমার স্ত্রীকে আমি একবারের জন্যও দেখ্‌তে চাই, আপনি এর উপায় কোরে দিন।”

তিনি আপত্তি করিয়া বলিলেন —"আপনি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গিয়ে জানান, চেষ্টা কল্লে তিনি হয় ত' আপনার আশা পূর্ণ করতে পারেন।"

আমি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাঁহার কথামত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কামরায় গিয়া হাজির হইলাম। তিনি অতি ভদ্রলোক, আমার অনুরোধে কর্ণপাত করিয়া একজন নার্সের সহিত আমাকে যথাস্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

ঘরখানির মোটামুটি সৌন্দর্য্য মন্দ নহে; চারিদিকটা শ্বেত-পাথরে মোড়া, সারি সারি লোহার খাট সাজান, প্রত্যেক খাটে ধপ্‌ধপে বিছানা পাতা, মাথার উপরে পাখা ও ইলেক্‌ট্রিকের ডুম ঝুলান। নার্স আমাকে শ্রীমতির শয্যার পার্শ্বে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"এই আপনার রোগী?"

আমি—"হুঁ" বলিয়া মনে মনে বলিলাম—"হা ভগবান্, কল্‌কাতায় এসে এ দৃশ্যও আমায় দেখ্‌তে হোলো।"

নার্স অদূরে গিয়া একখানি চেয়ারের উপর উপবেশন করিল। আমি একখানি টুলের উপর বসিয়া ধীরে ধীরে শ্রীমতির নাড়ী ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। জ্বরের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বোধ হইল। ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইয়া তুলিলাম।

সে অতি কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু স্বরে বলিল—"তুমি এসেচ, এতক্ষণ আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম। আমার কাছে তুমি বোসো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখন অবস্থা কি রকম বুঝ্‌চ?"

শ্রীমতি বলিল—"আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ বোধ কচ্চি। আমায় ক্ষমা কর, আমি না বুঝে পথে বেরিয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আঘাতটা কি খুব বেশী লেগেচে?"

শ্রীমতি—"দক্ষিণ পা-খানা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে, বড় ব্যথা।"

আমি মনে মনে বলিলাম—"হতভাগিনী, ব্যথার বোঝা তুমি শুধু একাই বহন কচ্চ না, আমিও এর কিছু ভাগ নিয়েচি।"

সে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এখানে তোমায় কে নিয়ে এলো?"

শ্রীমতি বলিল—"সে একটি ভদ্রলোক। তাঁরই মোটার গাড়ীতে আমি চাপা পড়ি। সকলে গাড়ী ধোরে টানাটানি করতে লাগ্লো, তারপর কি হোলো জান্‌তে পাল্লুম না, আমি জ্ঞানহারা হোয়ে-ছিলুম। যখন চেতনা হোলো দেখ্‌লুম এইখানে আমি শুয়ে, পা দুটো এমন শক্ত কোরে বাঁধা—নড়বার চড়বার শক্তি নাই। পাশে দেখ্‌লুম সেই ভদ্রলোকটি দাঁড়িয়ে। আমি চোখ মিলে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি করুণস্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন কি একটু সুস্থ হোয়েচ মা? আমি যেতে পারি কি?"

আমি জান্‌তুম না যে তাঁরই মোটার আমার অঙ্গহানি কোরেচে। তিনি অতি দুঃখের সহিত বলিলেন—"এই হতভাগ্যের মোটরই তোমায় আহত কোরেচে, মা! আজ আমি প্রতিজ্ঞা কল্লুম—জীবনে আর আমি কখনো মোটারে চাপ্‌ব না।" যাতনার নিষ্ঠুর পীড়নের মাঝেও ভদ্রলোকটির আচরণ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। আমি

তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম—"আপনি অনুতাপ কর্বেন না বাবা, এ আমার অদৃষ্টের ফল।"

আমি আগ্রহান্বিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ভদ্রলোকটি কি বল্লেন?"

শ্রীমতি—"কিছু বল্লেন না, নার্সের সঙ্গে কি বলা কওয়া কোরে তিনি চোলে গেলেন। হাঁ—যাবার সময় আমায় বোলে গেলেন—"তুমি ভেবোনা মা, এখান থেকে বেরিয়েই আমি তোমার স্বামীকে খপর দিয়ে যাবো। আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হবার আগেই তিনি যদি এখানে আসেন, আমার বাড়ীতে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ো।"

আমি আশ্বস্ত-চিত্তে বলিলাম—"তিনি ভদ্রসন্তান বটে! তাঁর ঠিকানা নিয়েচ?"

শ্রীমতি বলিল—"হাঁ, তিনি জেমসেদপুরের জমিদার। নং—এলগিনরোডে বাড়ী ভাড়া কোরে আছেন।"

আমি তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম।

শ্রীমতি বলিল—"গিরীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।"

আমার চক্ষুদ্বয় অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীমতি তাহা লক্ষ করিয়া আমায় বলিল—"কিসের জন্য ভাবচ বল দেখি?—ভেবোনা, এমন বিপদ ত' আমাদের ঘরে প্রায়ই আছে। আমরা বাহ্যিক একটা ক্ষত দেখে ভাবনায় হতাশ হোয়ে পড়ি, কিন্তু হৃদয় খানার ভিতরে এমন কত ক্ষত পরিপূর্ণ বল দেখি? যাও—আর ভেবোনা, তুমি ভাবলে, তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখ্‌লে—আমাকেও ব্যথা পেতে হবে।"

আমি আবেগস্ফুরিত-কণ্ঠে বলিলাম—"এখন তা হোলে আসি ?"

শ্রীমতি আমাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিল—"হাঁ যাও ; কাল আস্‌বার সময় আমার জন্য এক বাক্স আঙ্গুর কিনে এনো।"

আমি সম্মত হইলাম।

সে জিজ্ঞাসা করিল—"ক'দিন আপিসে না গেলে ক্ষতি হবে কি ?"

আমি উত্তেজিতস্বরে বলিলাম—"ক্ষতি হোলেও আমি যাবো না।"

নার্স আসিয়া আমার সাম্‌নে দাঁড়াইল। অশ্রুপূরিতকণ্ঠে আবার বলিলাম—"আমি তবে চল্লুম।"

সে পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিল—"হাঁ যাও ; দেখ, আর একটা কথা শুনে যাও। সেই ভদ্রলোকটি যাতে পুলিশের হাঙ্গামে না পড়েন তুমি তাই কর্ব্বে। তিনি ইচ্ছা কোরে আমায় আঘাত করেন নি, আমাদেরও কর্ত্তব্য-নয় যে ইচ্ছা কোরে তাঁকে পুলিশের হাতে অপমান করানো।"

নার্স আমায় বলিল—"বাবু, পেসেণ্টকে আর বেশী বকাবেন না, আপনি এইবার যেতে পারেন।"

আমি যাইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলাম। আসিতে আসিতে আর একবার বলিয়া আসিলাম—"তবে আমি চল্লুম।"

পথে বাহির হইয়াই গিরীন্দ্রবাবুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। ট্রামারোহণে ধর্ম্মতলায় আসিয়া, কালীঘাটের ট্রামে চাপিয়া বরাবর এল্‌গিনরোড ও রসারোডের সংযোগ স্থলে গিয়া নামিয়া পড়িলাম।

যথা নম্বরের বাটীর ফটকে গিয়া দেখিলাম, বসন্তের জ্যোৎস্নায় চারিদিকটা পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। ভিতরদিকের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা প্রাঙ্গণ, চারি ধারে মৃন্ময় আধারে যাবতীয় বৃক্ষ সাজান, গাড়ী-বারান্দার নীচে কাল রংএর বৃহৎ একখানা মোটার দাঁড়ান, খদ্দরের চাপ্‌কান পরা একজন দ্বারবান্ গেটে পাহারা দিতেছিল। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—এটা গিরীন্দ্রবাবুর বাটী কি না ?

সে প্রথমে আমার কথার জবাব দিল না। তীব্র দৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিয়া—"আমি কে, কি দরকার, কোথা হইতে আসিয়াছি" এই সব জিজ্ঞাসা করিবার পর বলিল—"এই বাড়ীই গিরীন্দ্রবাবুর বটে !"

আমি তাহাকে মিনতি করিয়া বলিলাম— "বাবুকে একবার খবর দাওগে, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেচি।"

সে বলিল—"বাবুর সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। বাবুর মোটার গাড়ীতে একটা মানুষ চাপা পোড়েচে, তাঁর মন মেজাজ বড় খারাপ।"

দ্বারবান্ জানিত না যে তাহার মনিবের মোটার গাড়ী কোন্ হতভাগ্যের জীবন-সঙ্গিনীকে আহত করিয়া আসিয়াছে। আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তাহার দ্বারা আমার কোনো উপকার হইবে না, সে নিরক্ষর একটা পশ্চিমে খোট্টা—তবুও তাহার হাতের কব্জির উপর আমার চক্ষু হইতে দুই ফোটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে বোধ হয় ব্যথা অনুভব করিল। শশব্যস্তে

উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"বাবু, আপনি আর কাঁদবেন না, এইখানে দাঁড়ান, আমি এখনি বাবুকে খপর দিচ্চি।"

সে বাটীর ভিতর চলিয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, দুই টাকা বক্‌সিসেও যে কাজ এত সহজে মিটিত না, দুই ফোঁটা অশ্রু সেই কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিল।

গাড়ী-বারান্দার সম্মুখের মোটারখানিকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম। প্রথমেই দেখিলাম, প্রিয়ার কোমলাঙ্গ হইতে দুর্বৃত্ত রক্ত-চিহ্ন হরণ করিয়া আনিয়াছে কি না। তাহার পর দেখিলাম, চাকার তলায় লৌহ-নির্ম্মিত কোনো ধারাল অস্ত্র আছে কি না। তাহার পর গাড়ীর একটা দিক ধরিয়া উঁচু করিয়া দেখিতে লাগিলাম, শয়তানের কলেবরটা ওজনে কত ভারি। পরক্ষণেই দ্বারবান্‌কে সঙ্গে করিয়া একজন খদ্দরভূষিত গৌরকান্তি প্রৌঢ় আসিয়া আমাকে ভিতরে আহ্বান করিলেন। সংবাদ লইয়া জানিলাম,—তিনিই স্বয়ং গিরীন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী।

বাটীর বারদিক্‌টা দেখিয়া মনে হইয়াছিল, ভিতরের ঘরগুলি বিদেশী সাজ-সজ্জা দ্বারা কতই না সুশোভিত। কিন্তু স্বদেশী মোটামুটি আস্‌বাব ব্যতীত বিদেশী কাচের সামগ্রী বা বিলাস সজ্জার কোনো চিহ্ন মাত্র নাই। কয়েকখানি মেহাগ্নি কাঠের চেয়ার, গৃহের অর্দ্ধেকটা জোড়া তক্তাপোস ও তোষক, উপরে রঙ্গিন খদ্দরের চাদর ও কয়েকটি তাকেয়া, দেওয়ালের গায়ে বঙ্গের কৃতী সন্তান-গণের ফটো টাঙ্গান, মাঝখানে জননায়ক মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের তৈলচিত্র সুশোভিত। চাকর,

দ্বারবান্ ছেলে মেয়ে সকলের পরিধানেই মোটা খদ্দর—সকলের গায়েই খদ্দরের জামা।

গিরীন্দ্রবাবু আমাকে যত্নসহকারে বসাইয়া বলিলেন—"আপনার স্ত্রী সাক্ষাৎ সাবিত্রী। তাঁর এই আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য আপনি ত' দুঃখিত হবেনই, কিন্তু আমার দুঃখটাকেও নিতান্ত কম বোলে মনে কর্ব্বেন না।"

আমি বলিলাম—"শুন্‌লুম আপনাদের ওপর নাকি পুলিশকেস হয়েচে, এ কথা সত্যি কি ?"

তিনি অবজ্ঞার ভরে বলিলেন—"তা হোক্‌গে, আমি সে জন্য দুঃখিত নয়, আপনার স্ত্রী নিরাময় হোলেই আমি সুখী হই।"

আমি—"আমার স্ত্রীর একটি অনুরোধ আছে।"

তিনি—"কি বলুন ?"

আমি—"পুলিশকেস যাতে না হয় সেই জন্য সে বারবার কোরে বোলে দিয়েচে।"

তিনি—"সে যা হবার হোক্‌গে, আপনার স্ত্রীর সম্বন্ধে আপনি এখন কি কর্‌তে চান ?"

আমি আবেগের ভরে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম নে,—"আমি এখন তাকে আরোগ্যরূপে পেলেই সুখী হই।"

তিনি বলিলেন—"আমার ইচ্ছা কলেজে একখানা রুম ভাড়া নেওয়া হোক্। তাঁর জন্য একজন দাসী নিযুক্ত করা হোক্। খরচের ভার আমি গ্রহণ কর্ব্ব।"

আমি কোনো প্রত্যুত্তর করিলাম না।

তিনি বলিলেন—"আঘাত এমন গুরুতর নয় যে, তাকে বেশী দিন কষ্ট পেতে হবে। তবে নিয়মিত চিকিৎসা হওয়ার দরকার।"

আমি নম্র স্বরে বলিলাম—"অতিরিক্ত ব্যয় কর্ব্বার কোনো দরকার নাই। গরিবের স্ত্রী আহত অবস্থায় ধপ্‌ধপে শয্যাটা যে পেয়েচে সেই তার পক্ষে যথেষ্ট।"

গিরিন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আপনার অন্তরের কথা ত' আপনি অকপট চিত্তে বোলে গেলেন, আমার কথাটাও শুনুন; একজনকে আক্রমণ করতে বেশী দেরি লাগে না, তাকে বাঁচিয়ে তোলাই বেশী আশ্চর্য্যের কথা। আমি গাড়ীর কোমল গদিতে শুয়ে আরাম কোরে বাড়ীতে আস্‌ছিলাম, আর আপনার স্ত্রী মহাময়ীর আরতি দেখে পদব্রজে যাচ্ছিল, এমন সময় আমার গাড়ী খানা তার বুকের উপর দিয়ে চ'লে এলো। আমি কিছুমাত্র জান্‌তে পাল্লুম না, যেখানকার লোক আমি সেই খানেই বোসে রইলুম,—আর সে ব্যথার বোঝা বুকে নিয়ে রুগ্ন শয্যায় গিয়ে শুয়ে পোড়লো। বলুন দেখি তার শুশ্রূষা করা আমার উচিত কি না?"

আমার জীবনের এত বড় ব্যথাটাকে গিরীন্দ্রবাবু যেন এক মুহূর্ত্তে কোথায় সরাইয়া দিলেন। আমি মনে মনে তাঁহার উদারতার প্রশংসা করিয়া বলিলাম—"মহাশয়, আপনার ইচ্ছা আপনি যে ভাবে হয় পালন করুন—আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।"

গিরীন্দ্রবাবু তাঁহার ম্যানেজারকে ডাকাইয়া আমাকে দশটা টাকা দিতে বলিয়া দিলেন। আমি গ্রহণ করিতে আপত্তি করিলাম। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—"আপনার স্ত্রীর শুশ্রূষার জন্যই আমি এ

টাকা আপনাকে দিচ্চি। আপনি যদি না গ্রহণ করেন আমি দুঃখিত হব।”

অগত্যা ম্যানেজারের নিকট হইতে টাকা দশটি গ্রহণ করিলাম। তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন,—কাল প্রাতঃকালেই এসে আমি যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি।

সেখান হইতে বাহির হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পাড়ায় আসিয়া দেখিলাম, যুবক ও বৃদ্ধগণের জটলায় চারিদিক্‌টা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। উৎকন্ঠিত চিত্তে নিকটবর্ত্তী হইয়া শুনিলাম, আমার ঘরের জানালা ভাঙ্গিয়া চুরি হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু চোর বেচারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। সে বাড়ীর মহিলাদের তাড়া পাইয়া যখন পলায়ন করিতেছিল, পাড়ার যুবকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে একটি গ্যাসপোষ্টে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। আমাকে দেখিতে পাইয়াই সম্মুখস্থ একটি যুবক চীৎকার করিয়া বলিল—“এই যে আপনি এসে পড়েচেন।” তাহাদের উৎসাহ যেন কত বাড়িয়া গেল। আর একটি যুবক চোরটিকে দেখাইয়া বলিল—“এই ভদ্রলোকটি আপনার জানালা ভেঙ্গে চুরি করে পালাচ্ছিলেন, আমরা হঠাৎ ধোরে ফেলেচি, ব্যবস্থা যা কর্‌তে হয় এইবার আপনি করুন।”

একটি যুবক চোরের অবনত মুখখানির সাম্‌নে দেশালাই জ্বালিয়া বলিল—“লোকটাকে চিন্তে পারেন কি না দেখুন দেখি? আপনাদের বাড়ীতে পরাণবাবু বোলে যে ভদ্রলোক ভাড়া আছেন, চেহারাখানা ঠিক তারই মতন নয়?”

চোরটি বাস্তবিকই সেই নরাধম পরাণচন্দ্র বিশ্বাস। আমি দেখিয়া লজ্জায় মুখ নামাইয়া লইলাম।

ইত্যবসরে একটি যুবক পাহারাওয়ালা ও জমাদারকে ডাকিয়া আনিয়া পরাণচন্দ্রকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইল। পুলিশের কবল হইতে উদ্ধারের পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সে আমার পা দু'টা জড়াইয়া ধরিল।

আমি কোন প্রকারে পা ছাড়াইয়া লইয়া নরেন্দ্রবাবুর পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি পুলিশকোর্টের একজন স্বনামজাদা উকিল। তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম— "মহাশয়, লোকটিকে বাঁচাতে পারা যায় না কি?"

তিনি বলিলেন—"স্বচ্ছন্দে, আপনি ফরিয়াদী না হোলেই পারেন।"

আমি বলিলাম—"জনমতের বাইরে দাঁড়িয়ে কাজ করা আমার উচিত নয়। কিন্তু লোকটাকে যে ধরিয়ে দেওয়া হবে এতে ফল কি? ছেড়ে দিলে বরং ওর চরিত্রের পরিবর্ত্তন হোতে পারে। তা ছাড়া ও যদি জেলে যায় ওর বুড়ো মা বোধ হয় আর বাঁচবে না, ওর স্ত্রী হয় ত' পথে দাঁড়ায়ে ভিক্ষা কর্ব্বে, আমি এই জন্য ওর মুক্তির প্রার্থনা করি।"

নরেন্দ্রবাবুর বাহ্যিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ উগ্র হইলেও তাঁহার অভ্যন্তর দিক্‌টা সরল। তিনি জমাদারকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় গিয়া হাজির হইলেন। আমিও তাঁহার পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি জমাদারকে বুঝাইয়া বলিলেন—

"দেখ, আসামীটাকে ছেড়ে দাও। ফরিয়াদী ওকে ক্ষমা কর্‌তে চাইচে।"

জমাদার বেচারা নরেন্দ্রবাবুকে সম্মান করিত। সে তাঁহার কথা মত আসামীকে আনিয়া হাজির করিল।

পরাণচন্দ্রের সে প্রফুল্ল মুখখানি যেন কত শুখাইয়া গিয়াছে। আমি নরেন্দ্রবাবুকে ইসারা করিয়া বলিলাম—"বেচারীকে আর কষ্ট দিয়ে দরকার নেই, আগে ওর বাঁধনটা খুলে দিতে বলুন।

নরেন্দ্রবাবুর কথামত জমাদার তাহার বাঁধন খুলিয়া দিল। জমাদার ও পাহারাওয়ালাদ্বয় তখনও তাহার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমি তাহাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম—"দেখুন পরাণবাবু, এই নরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহেই আজ আপনি বেঁচে গেলেন। নইলে যে গুরুতর অন্যায় আপনি কোরেচেন, পরিণামে আপনার অদৃষ্টে জেলই ছিল। যা হোক্ আপনাকে কিন্তু একটা প্রতিজ্ঞা কর্‌তে হবে"

পরাণচন্দ্র নতমুখ করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল—"আপনারা আমার জীবন রক্ষক, যা আদেশ কর্‌বেন আমি তাই কর্‌তে রাজী।"

আমি বলিলাম—"নরেনবাবুর পা ছুঁয়ে আপনি বলুন যে—এইবার থেকে আপনি সংসার কর্ব্বেন। দেখুন, পৃথিবীতে এর চেয়ে আর সম্মান কিছুতে নাই।"

পরাণচন্দ্র নরেন্দ্রবাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"এই

ব্রাহ্মণের পা স্পর্শ কোরে আমি প্রতিজ্ঞা কচ্চি,—আজ থেকে আমি সংসারের বশীভূত থাক্‌বো।”

নরেন্দ্রবাবুর অনুমতিক্রমে জমাদার ও পাহাওয়ালাদ্বয় চলিয়া গেল। তিনি পরাণচন্দ্রকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—“যাও হে, তোমার খুব জোর বরাত। পার ত’ জীবনে এই ভোলানাথবাবুর উপকারটা বিস্মৃত হোয়ো না।”

পরাণচন্দ্র অবনত মস্তকে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বাটিতে আসিয়া আমার চক্ষু আর মুদ্রিত হইল না। সারা রজনী শয্যায় পড়িয়া ছট্‌পট্‌ করিয়া প্রাতঃকালে আমি এল্‌গিনরোডে যাত্রা করিলাম।

১৪

গিরীন্দ্রবাবুর চেষ্টা ও ডাক্তারের চিকিৎসায় শ্রীমতি পনর দিনের ভিতর আরোগ্যলাভ করিল। এই কয়দিন অফিসের কথা আমার আদৌ মনে ছিল না। ষোল দিনের দিন সকালে তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়া গেটকিপারের মুখে শুনিলাম,—আমার পোষ্টে অন্য লোক নিযুক্ত করা হইয়াছে। দুর্য্যোগের হাওয়ায় বুকের ভিতরটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সেক্‌সানের বড় বাবুর কাছে গিয়া তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা করিলাম।

তিনি উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন,—"কি মতলব হে, শুভ সমাচার এখনো পাওনি বুঝি ?"

আমি নম্র হইয়া বলিলাম—"মহাশয় আমি ইচ্ছা কোরে কামাই করিনি, আমার স্ত্রী মৃত্যু-শয্যায় পোড়েছিল, আমায় ক্ষমা করুন, আমার চাক্‌রিটি যেন রক্ষা হয়।"

তিনি ক্রোধ চক্ষু করিয়া বলিলেন—'এটা আমার বাবার ষ্টেটের কাছারীবাড়ী নয় যে, আমি যা হুকুম কর্ব্ব বাহাল হবে। সাহেবের কথামত তোমাকে জবাব দেওয়া হয়েচে, এর ওপর দ্বিরুক্তি কর্ব্বার কিছু নাই।"

আমি নিরাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"এর কি আর বিহিত হবে না ?"

তিনি নিজের কাজে মনোনিবেশ করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন—"একখানা এপ্লিকেশন কোরে দেখ্‌তে পার—সাহেবের যদি মত হয়।"

একের স্থলে তিনখানি এপ্লিকেশন করিয়াও সাহেবের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। একটা বিপদ অবসান হইতে না হইতে আবার এই অদ্ভুত বিপদের সৃষ্টি!—দুর্ভাবনার শেষ কোথায় কে জানে।

ক্রমন্বয় দুইমাস পূর্ণ হইয়া গেল,—চাকুরী আর মেলে না। মুদীর পাওনা টাকার জন্য তাগাদা পাড়েজী'র অসদ্ব্যবহার আর সহিতে পারা যায় না। দ্বিপ্রহরে মুদী আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল কল্যকার মধ্যে তাহাদের টাকা চুকাইয়া দিতে না পারিলে তাহারা নালিশ করিবে। নরেশবাবুর পাঁড়েজী আসিয়া চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল—"ভাড়ার টাকা আজই দিতে হইবে, না দিতে পারিলে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে, সে ঘরে তালা দিয়া যাইবে।"

আমি শ্রীমতিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি উপায় করা যায়?"

সে বলিল—উপস্থিত আমার হারগাছটা বিক্রি কোরে এদের দাও, অদৃষ্টে থাকে ত' আবার হার পোর্‌বো।"

এ যুক্তি মন্দ নয়; কিন্তু একজনের স্নেহের দান এইভাবে খোয়ান উচিত কি? আমি বলিলাম—"তাই যদি হয় বিক্রি না কোরে বন্ধক রাখা হোক্, সময় হয় ত' আবার ফিরিয়ে নিতে পারা যাবে।"

শ্রীমতি দ্বিরুক্তি করিল না। আমাদের ঘরের পাশে হরিনারায়ণ

বসু নামীয় এক ভদ্রলোক বাস করিতেন, তিনিও আমার ন্যায় চাক্‌রী হারা। দৈনন্দিন উপোস, পাওনাদারের ভর্ৎসনা ও দুঃখের তাড়না সহিতে না পারিয়া আজ বার দিন হইল তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে স্বদেশে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার খুব সৌহৃদতা জন্মাইয়াছিল। তাঁহাকে ডাকিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার এই হারছড়া বন্ধক রেখে পঞ্চাশটা টাকা আমায় আনিয়ে দিতে পারেন?"

তিনি আগ্রহের সহিত বলিলেন—"আপনার যদি উপকার হয় কেন পারব না। মধুমিস্ত্রিরের বাড়ীতে গেলেই টাকা পাওয়া যাবে।"

আমি হারছড়া তাঁহার হাতে দিয়া বলিলাম—"পাঁড়েকে এখনি টাকা দিতে হবে, আপনি যত শীগ্‌গির পারেন আস্‌বেন। পঞ্চাশ টাকা যদি না পান অন্ততঃ চাল্লিশ টাকাও আন্‌বেন।"

তিনি হারছড়া লইয়া দ্রুত চলিয়া গেলেন। পাঁড়েজীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম—"একটু দেরী কর পাঁড়ে ভাড়া আমি এখনি চুকিয়ে দিচ্চি।"

এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইয়া গেল হরিনারায়ণবাবু আর ফিরিয়া আসিলেন না। পাঁড়েজী তাগাদার উপর তাগাদা আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম—"পাঁড়ে, আমার পরিবারের জিনিষ বন্ধক রেখে টাকা আন্‌তে পাঠিয়েচি—একটু দেরী কর।"

সে বলিল—"হাম জাস্তি দের্ করনে নেহি সেকেগা, ঝল্টি আভ চুকাও।"

তাহাকে বসিতে বলিয়া হরিণারায়ণবাবুর সন্ধানে বাহির হইলাম।

সমস্ত পাড়াটা অন্বেষণ করিয়াও তাহার খোঁজ পাওয়া গেল না মধুমিত্তিরদের বাড়ী আমি চিনিতাম। তাঁহাদের কর্ত্তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, প্রায় আধ ঘণ্টা হইল হার বন্ধক রাখিয়া সে ষাট টাকা লইয়া গিয়াছে।

ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহাকে পঞ্চাশ টাকার কথা বলিয়া দিয়াছিলাম, তিনি ইচ্ছামত ষাট টাকাই বা নিলেন কেন? বাতুলের ন্যায় চারিদিক খোঁজাখুঁজি করিয়া দেড় ঘণ্টার পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম। পাঁড়েজীকে একটা টাকা দিয়া বলিলাম—"তোমাকে অনেক্ষণ বোসিয়ে রেখেচি পাঁড়ে, এই টাকাটা নিয়ে তুমি যাও, এটা তোমার বক্‌সিস্। আর একটা দিন আমায় সময় দাও ভাই, কাল আমি তোমার দেনা মেটাবো। আমি যাকে জিনিষ বন্ধক দিয়ে টাকা আন্‌তে পাঠিয়েছিলুম সে লোকটা বোধ সরে পোড়লো।"

পাঁড়ে সরিয়া পড়ার কথা শুনিয়া বিস্ময়ে লাফাইয়া উঠিল। আমাকে ধিক্কার দিয়া বলিল—"আপ্ তো পহেলা নম্বর বেয়াকুব বন্ গিয়া। চোট্টা শালা লোক্‌কো এসি বিস্‌ওয়াস্ করনা আচ্ছা?"

আমি আবেগের ভরে বলিলাম—"অদৃষ্টে করায় কর্ম্ম তার কি দোষ।"

পাঁড়ে-জী তখনকার মত সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গেল।

আমি শ্রীমতিকে ডাকিয়া বলিলাম—"দেখ্‌লে মানুষের ব্যবহার?

আমি বিপদে পোড়ে তাকে বিশ্বাস কল্লুম সে সোরে পোড়লো। এখন উপায় কি করা যায় ?”

শ্রীমতি আমাকে স্তোকবাক্যে সন্তোস করিয়া বলিল—“কাল সকালে আংটী আর চিরুণীখানা রেখে টাকা যোগাড় কোরে নিয়ো।”

আমি বলিলাম—“এতে ক’টাকাই বা হবে।”

শ্রীমতি বলিল—“উপস্থিত ঝঞ্ঝট কিছু মিটবে ত’ ?—তারপর এক কাজ কোরো।”

কাজের নাম শুনিয়া আমার উদ্বেগ ষোল আনা বাড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—“কাজ ?—কি কাজ প্রিয়ে ? মোট বহন কর্‌তে পারি, চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ফেলতে পারি, পয়সার জন্য আমি সব কর্‌তে পারি, বল ত’ কি কাজ ?”

শ্রীমতি বলিল—“অত অধৈর্য্য হোয়ো না। বিকালে একবার সেই গিরীন্দ্রবাবুর বাড়ী যাও দেখি।”

আমি বাতুলের ন্যায় চাৎকার করিয়া বলিলাম—“কি কর্‌তে, ভিক্ষা কর্‌তে ? এই উদরের জন্য কেউ চুরি কচ্চে, কেউ হত্যা কচ্চে, কেউ জেল খাট্‌চে,—আমি ভিক্ষা কর্ব্ব—ক্ষতি কি ? কিন্তু ধনীর ভিক্ষাদত্ত অর্থে গরিবের সংসার ক’দিন চল্‌বে প্রিয়ে ?”

শ্রীমতি বলিল—“একবার গিয়েই দেখনা, যদি দু’দিন চলে সেই আমাদের ভাল। দু’দিনই যে গরিবের পক্ষে দু’হাজার বৎসর।”

আমি তাহার কথাই শিরোধার্য্য করিলাম।

তিন দিন কাটিয়া গেল গিরীন্দ্রবাবুর বাটী যাই যাই করিয়াও যাওয়া হইল না। কাছে এমন পয়সা নাই যে, আজ দ্বিপ্রহরে

অন্নের সংস্থান হয়। একটি বন্ধুর নিকট অনেক দিনের পাঁচটা টাকা পাওনা ছিল। সে দুঃসময়ে টাকা কয়টি চাহিবামাত্র আমি তাহাকে দিয়াছিলাম, কোনো দিনের জন্য তাগাদা করি নাই। এখন তাহার আর্থিক অবস্থা ভাল, বেলা নয়টা হইতে একটা পর্য্যন্ত তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া টাকা কয়টি চাহিলাম, অন্ততঃ একটি টাকার জন্য জিদ করিয়া ধরিলাম, তিনি বলিলেন—"দু'চার দিন না গেলে আমি টাকা দিতে পারি না। আজ আমার কাছে চার্‌টে পয়সাও নাই।"

নিষ্ঠুর দারিদ্রতাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া লইয়া নিরাশচিত্তে আমি ফিরিয়া আসিলাম। কাছে তিনটি পয়সা ছিল, দু'পয়সার মুড়ি ও এক পয়সার চিনি কিনিয়া লইয়া বাড়ীতে আসিলাম। শ্রীমতি এই দ্বিপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে রহিয়াছে। আহার গুলি তাহার সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া বলিলাম—"এই নাও, জগদীশ্বর আজ আমাদের এই আহার জোটালেন।"

তিন মাস পূর্ব্বে সুবাসিত জবাকুসুমে যে কেশ পরিসিক্ত হইত, সেই কেশ তৈলাভাবে আজ তাম্রাভ। চৌবাচ্চা পরিপূর্ণ জল ছিল। রুক্ষ স্নান করিয়া লইলাম। শ্রীমতি এক গ্লাস চিনির সরবৎ তৈরী করিয়া দিল। অর্দ্ধেকটা উদরস্থ করিয়া আমি বলিলাম—"আর ভাল লাগে না, গ্লাসটা ধর।"

উভয়ে মুড়ি ও সরবৎ খাইয়া বিশ্রামে মনোনিবেশ করিলাম। পরাণচন্দ্রের মাতা "বাবা কি কচ্চেন গো"—বলিয়া এক থালা খাবার লইয়া ঘরের মধ্যে আসিলেন। শশব্যস্তে দ্বারের দিকে

চাহিয়া দেখিলাম অদূরে পরাণচন্দ্র দাঁড়াইয়া। বৃদ্ধাকে অনুরোধ করিয়া আমি বলিলাম—"এ সব কেন মা, আপনি নিয়ে যান।"

পরাণচন্দ্র তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে আসিয়া আমার হাতদুটি চাপিয়া ধরিয়া বলিল—"সে দিন আপনারই সামনে নরেন্দ্রবাবু আমায় বোলেছিলেন, জীবনে কখনো উপকারীকে বিস্মৃত হোয়োনা, সে কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি ? আমায় দুঃখিত কর্বেন না ভোলানাথ বাবু, খাবার আপনারা নিন, এ খাবার আপনাদেরই পয়সায় তৈরী মনে কর্বেন।"

আমি লজ্জায় অবনত হইয়া তাঁহাকে বলিলাম—"নিতে আমাদের কোনো ক্ষতি নাই, কিন্তু ভাব্‌চি সেদিন আপনি কি ছিলেন—আজ কি হোয়ে দাঁড়িয়েচেন। অন্তরের দিকে চেয়ে আপনিই বলুন দেখি, সেদিনের চেয়ে আজ আপনি সুখী কি না ?"

পরাণচন্দ্র মাথা নিচু করিয়া রহিল। আমি তাহার মাতার হাত হইতে খাবারগুলি যত্নসহকারে নামাইয়া লইলাম। তাহারা চলিয়া যাইবার পর শ্রীমতিকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম—"আমাদের সামনে এই পরাণচন্দ্রই আজ ভগবানরূপে আবির্ভূত। এক গ্লাস জল গড়িয়ে নাও, কিছু আহার কর।"

আহারে হাত দিতে না দিতে ডাকপিয়ন আসিয়া একখানা খামে মোড়া চিঠি দিয়া গেল। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলিয়া দেখিলাম—ছোট আদালতের মোহরের ছাপ মারা। মুদী তাহার পাওনা টাকার জন্য নালিশ করিয়াছে।

যেখানকার খাদ্য দ্রব্য সেইখানেই পড়িয়া রহিল। জগদীশ্বরকে

উদ্দেশ করিয়া বলিলাম—"দয়াময়, তুমি যাকে দুঃখ দাও তার দুর্গতি বুঝি এই রকমই হোয়ে থাকে।"

উদ্ধারের কোনো পথ না দেখিয়া শ্রীমতির নির্দ্দেশমত গিরীন্দ্র-বাবুর বাটীতে যাইতেই স্বীকৃত হইলাম। কিন্তু আবাল্য দুগ্ধফেননিভ্ শয্যায় শায়িত ধনীর পুত্র গরিবের এই মর্ম্মব্যথা বুঝিবেন কি? পাপীয়া যেখানে দিক্ মুখরিত করিয়া প্রীতিভরা গীত নিয়ত গায়, দৈন যেখানে ভ্রমেও প্রবেশ করিতে সাহস করে না, দরিদ্রের ক্রন্দন সেথায় বাজিবে কি?

সারা পথ ভাবিতে ভাবিতে দেড় ঘণ্টার পর এল্‌গিনরোডে গিয়া পৌঁছিলাম।

গিরীন্দ্রবাবু তখন উপরে ছিলেন। একজন ভৃত্যকে দিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। মনে করিয়াছিলাম, আমার দৈনতার কথা তাঁহাকে ভাঙ্গিয়া না বুঝাইয়া দিলে তিনি হয় ত' বুঝিবেন না। সে ধারণা আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি আসিয়াই আমার অন্তরের ব্যথাটা যেন সহজেই ধরিয়া ফেলিলেন। বিস্মিত-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি কোনো বিপদে পড়েচেন? চেহারা দেখে যেন সেই রমক বুঝাচ্চে। ব্যাপার কি বলুন দেখি?"

আমি ছোট-আদালতের চিঠিখানি বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম।

তিনি পত্রখানি দেখিয়াই হাসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন "ওঃ—এই জন্যই অবস্থার এত পরিবর্ত্তন, বুঝেচি।"

আমি কৃতজ্ঞনয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম।

তিনি আমাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন—"আপনি ভাব্‌বেন না, টাকাকটা আমি দোবো।"

গভীর অন্ধকারতলে দাঁড়াইয়া দৃষ্টির সম্মুখে আমি যেন দেব-পুরুষের আবির্ভাব দেখিতে পাইলাম।

গিরীন্দ্রবাবু চিঠিখানি আমার হাতে দিয়া বলিলেন "সে যখন নালিশ কোরেছে, লেখাপড়া কোরে টাকাটা দিতে হবে। ভদ্র-লোককে আমার কাছে নিয়ে আস্‌তে পারবেন?"

আমি সঙ্কুচিত হইয়া বলিলাম—"এখানে আস্‌তে তিনি রাজী হবেন কি?"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন—"রাজী না হওয়াই সম্ভব। আপনি চলুন, আমি সেইখানে গিয়েই এর ব্যবস্থা কর্‌ব।"

দারোয়ানজীকে একখানি গাড়ী আনিতে বলিয়া তিনি কাপড় ছাড়িতে গেলেন। তাঁহার যে মূল্যবান মোটর গাড়ীখানি একদিন দুর্দ্দমনীয় শক্তিতে শ্রীমতির অঙ্গকে বিক্ষত করিয়া আসিয়াছিল, সম্মুখের বারান্দার নীচে সে খানি দাঁড়ান রহিয়াছে। দারোয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবুর এমন সুন্দর মোটর গাড়ী থাক্‌তে তোমায় ভাড়া গাড়ী আন্‌তে বল্লেন যে?"

দারোয়ানজী হাসিয়া বলিল—"বাবুজীর ওই রকম খেয়াল। সেই দুর্ঘটনার দিন থেকে উনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন যে মোটর গাড়ীতে আর চাপ্‌বেন না।"

শ্রীমতির কাছে তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। আর আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে দারোয়ানজী গাড়ী আনিয়া হাজির করিল। গিরীন্দ্রবাবু খদ্দর পরিধান করিয়া একটি চামড়ার ব্যাগসহ গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। আমি হর্ষফুল্ল অন্তরে তাঁহার পাশে গিয়া চাপিয়া বসিলাম।

চৌরঙ্গীরোডের পরিচ্ছন্ন পথ দিয়া গাড়ী দ্রুত-বেগে আসিয়া সন্ধ্যার আগেই আমাদের বাটীতে পৌঁছাইয়া দিল। গাড়ী হইতে নামিয়াই দেখিলাম পাড়েজী আসিয়া হাজির। গিরীন্দ্রবাবু আমাকে ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাহার সম্বন্ধে আমি সমস্ত বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিলাম। এই মাস লইয়া তাহাদের তিন মাসের ভাড়া পাওনা। গিরীন্দ্রবাবু ব্যাগ হইতে ত্রিশটি টাকা বাহির করিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন—"এই নিন্, ওদের টাকাটাও চুকিয়ে দিন।"

কথামত টাকাগুলি চুকাইয়া দিয়া পাড়েজীর কাছ হইতে তিন মাসের বিল কাটাইয়া লইলাম।

পাড়েজী রাম রাম বলিয়া প্রস্থান করিবার পর তাঁহার আদেশ মত আমি মুদীকে ডাকিতে গেলাম। সে প্রথমে আসিতে চাহিল না যখন শুনিল জেম্‌সেদ্ পুরের জমিদার আমার প্রতি স্নেহার্দ্র হইয়া দা'বির টাকা তিনি স্বহস্তে চুকাইয়া দিতে আসিয়াছেন, সে যেন কতকালের পরিচিত বন্ধুর মত আমার স্কন্ধদেশে হস্তার্পণ করিয়া দ্রুতপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হইল।

গিরীন্দ্রবাবু তাহাকে যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এনার টাকা চুকিয়ে নিয়ে আপনি মোকদ্দমা মেটাতে রাজী আছেন কি?"

তিনি অতি নম্রস্বরে বলিলেন—"আমার এতে কোনো অমত নাই, বিশেষ আপনি যখন বলচেন।"

হিসাব করিয়া দেখা হইল, আদালতের খরচ পর্যান্ত ধরিয়া তাঁহার মোটপাওনা তিরিশ টাকা আট আনা তিন পয়সা। গিরীন্দ্রবাবু তাঁহার ব্যাগ হইতে একতাড়া নোট টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার হিসাব তিনি কড়ায়-গণ্ডায় চুকাইয়া দিলেন। আমায় ইঙ্গিত করিয়া বলিয়া দিলেন যে, ওর নিকট হইতে একখানা রসিদ লিখিয়ে নাও।

মুদী চলিয়া যাইবার পর শ্রীমতি আসিয়া তাঁহার পদধুলি গ্রহণ করিল।

তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—"তুমি নিশ্চিন্ত হও মা!"

বাটীর অন্যান্য মহিলারা দূর হইতে আমাদের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল। গিরীন্দ্রবাবু তাহাদের ছিন্ন পরিধান ও মুখের কষ্ট-কালিমা নিরীক্ষণ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"এরা সকলেই কি এই বাড়ীর ভাড়াটিয়া?"

আমি "হাঁ" বলিয়া চুপ করিলাম।

তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"বড় দুঃখী এরা, এই খুব্‌রি মত এক একখানা ঘর রোদের আগুনে চারদিক্‌টা পোড়া বর্ষার জলে চারদিক্‌টা ভেজা, এরই মধ্যে এরা বাস করচে। এদের পুরুষগুলো যদি মানুষ হোতো, এত দুঃখে এদের কাল কাটতো না। হতভাগারা অন্নের জন্য হাহাকার করচে, চোখের জলে চারদিক্‌টা ভিজিয়ে তুলচে জীবনের সাম্‌নে এতবড় একটা দুঃখ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—তবুও এদের চৈতন্য হচ্চে না।"

কথাটা বাস্তবিকই অতিরঞ্জিত নহে। আমাদের কষ্টের পথ আমরাই প্রশস্ত করিয়া দিয়াছি,—অপরাধী আমরাই। আমি আর কোনো কথার উত্তর দিলাম না।

তিনি পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন—"যাদের ঘরে শাক-সব্জী ধানের মরাই নিত্য বাধা থাকৃতো, যাদের ঘরে গাভীকুল বন চ'রে এসে দুধ ঢেলে দিত, যাদের উঠানে পূর্ণচাঁদের উজল ধারা অবাধে খেলা করত, জ্যোৎস্নাপ্লুত ধরণীতলে শয়ন কোরে ধানের ক্ষেতের দিকে যারা তন্ময়-নেত্রে চেয়ে থাকৃতো—তারাই আজ অন্নের কাঙ্গাল, তারাই আজ আশ্রয়ের ভিক্ষুক। স্বজাতির এই শোচনীয় অবস্থা দেখ্‌লে প্রাণ ফেটে যায়, অশ্রু চেপে রাখা দায় হোয়ে দাঁড়ায়, মনে হয় দুঃখ যেন সারা দেশটাকে ছেয়ে বসেচে।"

গিরীন্দ্রবাবু ভাবের উদ্বেগে অনেক কথাই বলিয়া গেলেন। পল্লীভূমি পরিত্যাগ করিয়া আসিবার আগে এই রকম বন্ধু যদি একজন মিলিত, এই রকম উপদেশ যদি একদিন কাণে উঠত, দেশ ছাড়িয়া কখনই এতদূর আসিতাম না। এখন এই যমপথ হইতে কোনো প্রকারে যদি পাড়ি দিতে পারি, কখনও যদি সে দিন ফিরিয়া আসে—সুখের কল্পনাকে সেইদিন মনে স্থান দিব।

কৃতজ্ঞনয়নে গিরীন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া অশ্রুগদগদ্‌কণ্ঠে আমি বলিলাম—"মহাশয়, ভগবান্ স্বর্গে নাই, ভগবান্ নির্জ্জনে নাই, ভগবান্ অরণ্যে নাই, ভগবান্ রণস্থলে নাই, ভগবান্ ভবের মাঝখানে যেখানে জীবকুলের বাস সেই খানেই বিরাজ কচ্চেন। আমি বড় কষ্টে যাকে স্মরণ কোরেছিলুম, মুখের আহার ফেলে রেখে যাঁর দ্বারে

গিয়ে অতিথির বেশে দাঁড়িয়েছিলুম, সমুদ্র থেকে যিনি আমায় টেনে তুল্লেন, মৃত্যু থেকে যিনি আমায় পুনর্জীবন দিলেন,—তিনিই আমার ভগবান্। বিগ্রহ দূরে ফেলে দেওয়া যায়, শাস্ত্র পুড়িয়ে ফেলা যায়, মন্দির ভেঙ্গে শ্মশান কোরে তুলতে পারা যায়—কিন্তু সেই ভগবান্‌কে ভুলতে পারা যায় না। এই অন্ধকার কুটীরের ক্ষীণ দীপরশ্মির সম্মুখে আজ আপনিই আমার ভগবান্! আমাকে রক্ষা করুন, আমার পত্নীকে বাঁচান।"

গিরীন্দ্রবাবু আমাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া বলিলেন—"আমি যখন এসেছি আপনাদের বিহিত না কোরে ফির্‌ব না।"

আমি উত্তেজিত স্বরে বলিলাম—"আমি আর কিছু চাই না, আপনার ষ্টেটে আমার একটা চাকুরী কোরে দিন।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন—"তাই যদি আপনার প্রয়োজন হয়—আমি তাও দিতে পারি, কিন্তু আমার মত তা নয়, ভদ্রলোককে দাসত্ব শৃঙ্খলে বেঁধে খেতে পর্‌তে দেওয়াকে আমি উপকার ব'লে মনে করি না। যাকে বাঁচাতে হবে, যাকে মানুষ কোরে খাড়া কোরে তুল্‌তে হবে, তার জন্য এমন একটি উপকার সৃষ্টি কর্‌তে হবে—যা থেকে তার ভবিষ্যৎ জীবনে কষ্ট হবে না, জীবনের দীর্ঘ বেলা সে হেসে খেলে কাটাতে পার্‌বে।"

আমি আবেগস্ফুরিত কণ্ঠে বলিলাম "আপনি যা বল্‌চেন বলুন, আপনার কথাই আমার শিরোধার্য্য।"

তিনি বলিলেন—"যদি আমার কথা শুন্‌তে চান, আমার কাজ কর্‌তে চান—সপরিবারে স্বদেশে ফিরে যান। কল্‌কাতায় এসে

অনেকই ত' দেখলেন, পাথর গাঁথা পথ, বিপদসঙ্কুল মোটার—বিজলী ঘেরা অট্টালিকা, নানারঙ্গের তামাসা আরো কত কি, কিন্তু বলুন দেখি প্রাণের জিনিষ কিছু দেখতে পেলেন কি? চারদিকটা শুধু বিলাসিতার আবর্ত্তনে মোড়া। দিন দশ টাকা আয় কোরে আপনি সে সুখ খুঁজে পাবেন না, সেখানে দশ পয়সা আয়ে যা পাবেন। দেশে যেতে আপনারা রাজী আছেন কি?"

আমি আগ্রহের সহিত বলিলাম—"তা হোলে ত' আমরা জীবন ফিরে পাই, কিন্তু সেখানে গিয়ে যে দাঁড়াব এমন আশ্রয় আমাদের নাই।

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন—"আশ্রয় তৈরী কোরে নিতে আর কতক্ষণ লাগে? মা'কে আপনারাই বুক থেকে ফেলে দিয়ে এসেছেন, যখনি তাঁর পদপ্রান্তে গিয়ে আপনারা দাঁড়াবেন, তিনি আবার আপনাদের কোলে তুলে নেবেন।"

আমি আবেগের ভরে বলিলাম—"আপনার আশীর্ব্বাদ সত্য হোক্। মায়ের চরণে আবার আমরা লুটে পোড়্বো, দেখি এ আগুন নেভে কি না?

তিনি বলিলেন—"এক কাজ করুন, আমি কিছু টাকা আপনাদের দিচ্চি—দেশে গিয়ে খানিকটা জমি কিনুন, পরিশ্রম কোরে একটা কৃষিক্ষেত্র গোড়ে তুলুন, অন্নের জন্য চীৎকার করতে হবে না, চাকরীর জন্য দরখাস্ত নিয়ে ছুটতে হবে না, ফলে ফুলে ভরা বসুন্ধরা আবার হেসে উঠবেন, ভারতের সত্যযুগ আবার ফিরে আস্বে।"

আমি অবনত মস্তকে তাঁহার বাক্য-পালন করিতে স্বীকৃত হইলাম। তিনি এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন—"এই

নিন্, এতে পাঁচ শত টাকা আছে, উপস্থিত কাজ চালিয়ে নিন্‌গে, দরকার হোলে আমি আরো কিছু সাহায্য কর্ব্ব।"

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ঘড়ি দেখিয়া তিনি বলিলেন—"রাত হোয়েচে, আমি এখন চল্লুম। আপনারা যত শীগ্‌গির পারেন স্বদেশের দিকে রওয়ানা হোন্। আর একটা কথা, বিলাসিতা বর্জ্জন কর্‌তে চেষ্টা করুন, বিলাতী কাপড় ত্যাগ কোরে দিন, খদ্দরের বাহ্য চাক্‌চিক্য নাই বটে, কিন্তু পবিত্রতা ওর সর্ব্বাঙ্গটায় মোড়া। খদ্দর আপনিও ব্যবহার করুন, আপনার সাধ্বী স্ত্রীকেও ব্যবহার কর্‌তে শেখান।"

তিনি বাড়ী যাইতে উদ্যত হইলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর হইতে আলোটি বাহির করিয়া আনিয়া তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিলাম।

চার গণ্ডা পয়সার অভাবে দ্বিপ্রহর-বেলা যাহারা অনশনে অতিবাহিত করিয়াছে, নিশার প্রারম্ভকালে তাহারা পাঁচ শত টাকার মালিক।

আনন্দ আর চাপিয়া রাখা যায় না। শ্রীমতির কাছে আসিয়া হাসিয়া বলিলাম—"ভাগ্যি তুমি গিরিন্‌বাবুর স্মরণাপন্ন হোতে বোলেছিলে, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলুম।"

শ্রীমতি হাসি মাখা মুখে বলিল—"আমার কি বক্‌সিস্ দিচ্চ বল।"

আমি বলিলাম—"কি চাও বল? আমার এই হৃদয়খানার মাঝখানে তোমার প্রার্থনার বস্তু কি আছে দেখ।"

শ্রীমতি—ওসব আর দেখ্‌তে চাইনি, সে চোখ এখন হারিয়ে ফেলেচি। এখন যা দেখ্‌তে চাই আমায় দেখাতে পার ?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—সে কোন্ জিনিষ ?

সে বলিল—"আমি দেখ্‌তে চাই আমার সেই কলাবাগান, আমার সেই খিড়কীর ঘাট, কল্‌কাতার আবর্জ্জনা এদ্দিন আমায় সব ভুলিয়ে রেখেছিল, আজ আমায় তুমি সেইখানে নিয়ে চল। সেই বকুলবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বোসে হৃদয়মন্দিরে আমি তোমারই প্রতিমূর্ত্তি আঁকৃব। নির্জ্জনে বোসে নিজে দেখ্‌বো—আর তোমায় দেখাবো।"

পর দিন প্রত্যূষে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া হাজির হইলাম। ষ্টেশনে হোরমিলার কোম্পানীর অফিসের একজন বাবুর সহিত আমার দেখা হইল। তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। আজকাল লোকের দরকার হোয়েচে, একখানা এপ্লিকেশন কোরে বড় বাবুকে কিছু জল খাবার দিলেই চাক্‌রী পেতে পার।"

আমি তাঁহাকে, তাঁহার হোরমিলার কোম্পানীকে এবং কলিকাতার দাসত্ব-প্রথাকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিলাম—"মহাশয়, আমরা আজ মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় নিয়ে আমাদের পূর্ব্ব নিবাসে ফিরে যাচ্চি। চাক্‌রীর কথা আর বল্‌বেন না—বরং চরকার কথা উত্থাপন করুন।

সম্পূর্ণ।

